অনুবাদ সিরিজ

● পিয়ের লোটি ●

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনুদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

এপ্রিল
১৯৫৯

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা – ৯

উপহার

আইসল্যাণ্ড ফিসারম্যান

[প্রথম লোটি]

১

পাঁচজন জেলে সেই আঁধার ঘরে। বৃষস্কন্ধ পাঁচটা পুরুষ ঘর-জোড়া এক টেবিল ঘিরে ব'সে ব'সে মদই গিলছে শুধু। নোনা গন্ধ ঘরের গুমোট বাতাসে।

নোনা, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। চা'র দেয়ালের বাইরে অপার জলধি, আইসল্যাণ্ডের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। মাছ-ধরা বোট এই "মেরী"। তারই খোলের ভিতর এই ঘর। জেলেদের শোয়া-বসা সব এখানেই। দেয়ালের গায়ে গায়ে তিনখানা তক্তপোষ, তাতে তারা ঘুমোয়। আর তক্তপোষের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কাঠের বাক্স, তাদের ভিতরে জেলেদের কাপড়-চোপড়; খাওয়ার সময়ে তারাই করে চেয়ারের কাজ।

বোটের খোল, কাজেই একটা প্রান্ত তার সরুপানা, টেবিলও কাজে কাজেই সেদিকটাতে সরু। সেদিক একটু বেশী অন্ধকারও। একমাত্র লণ্ঠন, যেটা ছাদ থেকে ঝুলছে, তার কাঁপা-কাঁপা আলো পৌঁছোয় না সে-প্রান্তে। এ-ঘরের দরজাও ছাদে। এমন কায়দায় তা বন্ধ থাকে যে ছাদের উপর দিয়ে বড় ঝড় ঢেউ গড়িয়ে গেলেও এক ফোঁটা জল খোলের ভিতর পড়বে না।

স্টোভে আগুন জ্বলছে, ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে সেই আগুনের ধারে। কাপড়ের বাষ্প আর পাঁচ পাঁচটা মেটে পাইপ-থেকে-বেরুনো চুরুটের ধোঁয়া এক সাথে মিশে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই খুপরির বদ্ধ হাওয়ায়।

ছাদ এত নীচু যে এই লম্বা-লম্বা মানুষগুলির সোজা হয়ে দাঁড়াবারই উপায় নেই এখানে। সে-চেষ্টা করতে গেলে উপরের কড়িকাঠে ঠুকে যাবে মাথা! আর কী মোটা কড়িকাঠ এই বোটে। জলযানে এমন মোটা কাঠের ব্যবহার দেখলে আনাড়ির চোখ ছানাবড়া হয়ে যাওয়ারই কথা।

শুধু কড়িকাঠ ব'লে নয়। সব কাঠই এখানে অসম্ভব মোটা। দেয়ালগুলো যে কত পুরু, তা আন্দাজ করাই শক্ত। ঐ পুরু কাঠে নোনা ঢুকছে আজ দুই যুগ ধ'রে। তবু "মেরী" এখনও মজবুত রয়েছে রীতিমত, কাপ্তেন গার্মিয়ার মনে করেন, আরও এক যুগ অর্থাৎ তাঁর জীবনকালটা তিনি এই মেরীর খোলেই কাটিয়ে যেতে পারবেন।

খোলের ভিতর একটা প্রান্ত সরু, আগেই বলা হয়েছে। সেইখানে আছেন মেরীমাতার এক মৃন্ময়ী মূর্তি। বহুদিনের মূর্তি, কিন্তু পুরোণো-কালের কারিগরেরা কী চমৎকার রংই যে ফলা'ত পুতুলে, সে-রং এখনও জ্বলজ্বল করছে—নতুনের মতন। লালে নীলে জমকালো মায়ের সে-মূর্তি —এই বিবর্ণ ধোঁয়াটে খুপরিতে একটু বুঝি আনন্দের ছোঁয়াচই লাগাতে চাইছে।

বিপদ আপদ মৃত্যুভয় ত জেলের জীবনের নিত্যসাথী। কত কত ঝড়ের রাতে মরণের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে কত কত ধীবর যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে এই মৃন্ময়ী মূর্তির করুণা ভিক্ষা ক'রে, কে তার হিসাব রাখে! আজও মায়ের পায়ের কাছে দুই গুচ্ছ নকল ফুল পেরেক দিয়ে আঁটা রয়েছে, আর রয়েছে একটা জপের মালা। সেই সব বিপন্ন ভক্তেরই পূজার অর্ঘ্য।

এই পাঁচটা লোকেরই পোশাক একরকম। নীল পশমের আঁটো জার্সি একেবারে কোমরবন্ধে এসে ট্রাউজারের তলায় ঢুকেছে। মাথায় এক অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ, আলকাতরা-মাখা মোটা কাপড়ের টুপি। এ-টুপি ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমের ঝড় থেকে মাথা বাঁচাবার কোন উপায় নেই ব'লে টুপিটার নামকরণই হয়েছে দখিন-পচিমা।

বয়স অবশ্য সকলের এক নয়। কাপ্তেনের হয়ত চল্লিশ হতে পারে। তিনজনের পঁচিশ থেকে ত্রিশ, আর বাকী একজনের, নাম তার সিলভেস্টার, বয়স মাত্রই সতেরো। লম্বায় চওড়ায় সে অবশ্য ইতিমধ্যেই অন্যদের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখে কচি কচি কালো দাড়িও গজিয়েছে কিছু। কিন্তু চোখ দু'টিতে এখনও তার বালকের সারল্য। নীলচে-ধূসর সে-চোখের দৃষ্টি এখনও অতি কোমল ও অতি শুচি।

অন্ধকার ছোট্ট খুপরিতে পাশাপাশি ব'সে ভারী আয়েস পাচ্ছে এই পঞ্চনাবিক। বাইরে রয়েছে সমুদ্র আর রহস্যময়ী নিশীথিনী। অতল

কালো জলরাশির অন্তহীন নিঃসঙ্গতা। দেয়ালে একটা পিতলের ঘড়ি। এগারোটা বাজল তাতে।

এগারোটা। রাত এগারোটাই অবশ্য।

কাঠের ছাদে বৃষ্টি পড়ছে চড়বড় শব্দে।

বিয়ে-থাওয়া ঘর সংসারের কথাই হচ্ছে, সুরা আর আপেল নির্যাসের সাথে সাথে। কথাবার্তা নির্দোষ। পেশায় এরা জেলে মাত্র, কিন্তু অশালীন ব্যবহারকে এরা কায়মনোবাক্যে বর্জন ক'রে চলে। ব্রিটানির এই ধীবরেরা।

খুবই আয়েসে কাটছে সময়। তবে সিলভেস্টার একটু আনমনা। ইয়ান এখনো ছাদ থেকে নামেনি ব'লে। ফরাসী জাঁ-নামটা ব্রিটানির লোকে উচ্চারণ করে 'ইয়ান' ব'লে।

ইয়ান এখনো কাজ ক'রে চলেছে ছাদে ব'সে? এত কাজ যে খাওয়ার কথাও মনে নেই? কাপ্তেন বললেন—"রাত যে দুপুর হ'ল!"

এই ব'লে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ছাদের দরজায় মাথা লাগিয়ে। সুকৌশলে একটু চাড় দিতেই দরজা খুলে গেল। অমনি উপর থেকে আশ্চর্য একটা আলো খোলের ভিতর এসে পড়ল এক ঝলক।

"ইয়ান! ইয়ান! ওরে বাপু ইয়ান!" ডাকলেন তিনি চেঁচিয়ে। না চ্যাঁচালে ইয়ান শুনতে পাবে না। বৃষ্টি-বাতাসের যা দাপট!

ইয়ানের জবাব পাওয়া গেল—"যাই—"

ছাদের দরজা আদ্ধেক-পরিমাণ খোলা হয়েছিল মাত্র এক মিনিটের জন্য। তারই ভিতর দিয়ে আশ্চর্য এক আলো এসে ঢুকেছিল ভিতরে। প্রায় দিবালোকের মতই সে আলো উজ্জ্বল। সময়? প্রায় দুপুর রাত। কিন্তু আলোটা প্রায় দিনের আলোর মত। বহু-বহুদূরের কোন রহস্যময় আয়না থেকে প্রতিফলিত কোন্ অজানা দেশের গোধূলি-আলোক যেন।

দরজা বন্ধ হতেই আবার সেই আগের আঁধার। ঝুলন্ত ছোট্ট বাতিটা থেকে হ'লদে মিটমিটে আলো। কাঠের মই দিয়ে ভারী কাঠের জুতো-পায়ে নেমে আসছে ইয়ান।

ইয়ান নামল এসে। দাঁড়াতে হ'ল দেহটাকে প্রায় দু'ভাঁজ ক'রে। তখন তাকে দেখতে হল বিরাট একটা ভাল্লুকের মত প্রায়। কারণ লোকটা লম্বায় চওড়ায় একটা দৈত্যেরই সমান বলতে গেলে। এসেই মুখটা বিকৃত

করল। বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার পরে ঘরের ভিতরকার এই বন্ধ হাওয়ার নোনা গন্ধ কেমন যেন লাগছে।

সাধারণ মানুষের চাইতে এর অবয়বগুলো অনেক বেশী বড়। বিশেষ ক'রে ওর কাঁধ। কী অসাধারণ চওড়া! তোমার সামনে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, জার্সির নীচে কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠবে দু'টো ফুটবলের মত। বড় বড় দু'টো বাদামী চোখ অনবরত ঘুরছে এদিকে-ওদিকে। তার দৃষ্টি কখনো মনে হবে লাজুক, কখনো উদ্ধত।

সিলভেস্টার এগিয়ে এসে ইয়ানকে জড়িয়ে ধরল দুই হাত দিয়ে। খুবই ভালবাসে ইয়ানকে। কারণও আছে তার। এই ইয়ানের এক বোনকে বিয়ে করবে সিলভেস্টার। কথা হয়েই রয়েছে একরকম। সেই সম্পর্কে ইয়ানকে সে দাদার মতই ভাবে। ইয়ান হেসে একবার তাকাল ওর দিকে। দাঁত বেরিয়ে পড়লো তার। দাঁতগুলি ছোট, দেহের অন্য সব প্রত্যঙ্গের অনুপাতে। গোঁফ জোড়াও ছোট, যদিও ইয়ান তাদের ছাঁটে না কখনও। ওষ্ঠের উপরে সরু ক'রে পাকানো সেই গোঁফ। দুই প্রান্তে ঝাড়ালো হয়ে ঝুলে পড়েছে। দাড়ি ছোট ক'রে ছাঁটা। লালচে গালে পাকা আপেলের আভা।

ইয়ান খেতে বসল। অন্য সবাইয়ের খাওয়া তখন শেষই হয়ে গিয়েছে। তবু ইয়ানকে সঙ্গদানের জন্য সবাই নিজের নিজের গেলাস ভর্তি ক'রে নিল নতুন ক'রে। সাধারণভাবে বিয়ের কথা নিয়েই আলাপ চলছিল এতক্ষণ। তারই জের টেনে সিলভেস্টার জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কবে বিয়ে করছ, বল ত ইয়ান ?"

কাপ্তেনও ঐ ধুয়োই ধরলেন—"সত্যি ইয়ান, এত বড় ধুমসো জোয়ান একটা, বয়স হ'ল সাতাশ। এখনও আইবুড়ো থাকতে লজ্জা করে না তোমার ? মেয়েগুলো ভাবে কী তোমায় দেখলে, বল ত ?"

সিলভেস্টার আবারও অনুযোগ করল—"তোমার সত্যিই আর দেরি করা উচিত নয় দাদা বিয়ে করতে।" অনুযোগের তার কারণ আছে। তাদের দেশে, ব্রিটানিতে, সিলভেস্টারেরই দূর-সম্পর্কের এক বোন আছে অতি সুন্দরী, অতি ধনবতী, শৈশবে কৈশোরে প্যারি শহরে লালিতা—সে যে ইয়ানের অনুরাগিণী হয়ে পড়েছে, তা ত জানে সিলভেস্টার! তাই তার এই জেদ—"তোমার আর বিয়েতে দেরি করা উচিত নয়।"

আর ইয়ান? বড় বড় চঞ্চল চক্ষু দু'টি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে ইয়ান তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতেই বলল—"বিয়ে? ওঃ! তা, বিয়ে আমি করব বই কি! একদিন না একদিন করবই। তবে রক্তমাংসের দেহধারিণী কোন মেয়েকে নয়। আমার বিয়ে হবে এই সমুদ্রের সঙ্গে। যে দিন হবে, সেদিন মস্ত একটা বল-নাচের আয়োজন হবে, দেখো। আজ যারা এখানে আছ, তাদের সবাইকে সেইদিনের সে-উৎসবে যোগ দেবার জন্য আজই আমি নিমন্ত্রণ ক'রে রাখছি।"

ঠাট্টা? অবশ্যই ঠাট্টা এটা। কিন্তু এ-ঠাট্টা শুনে হাসতে পারল না কেউ। বরং ভিতরে ভিতরে কেমন-যেন শিউরেই উঠলো পাঁচটা জেলে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল যখন, রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। এইবার আবার কাজ সুরু হবে। মাছ ধরা এ-সময়ে চলে অহোরাত্র। এত মাছ সমুদ্রে, টোপ ফেলা-মাত্র খাচ্ছে। বড় বড় কড মাছ। গত ত্রিশ ঘণ্টায় তারা অন্ততঃ হাজার কড নৌকায় তুলেছে, হাত দু'খানা ব্যথায় টনটন করছে প্রত্যেকের। তবু কাজে কামাই দেবার কথাই ওঠে না। এ-সুযোগ হেলায় হারানো অসম্ভব। কড মাছের একটা বিশাল ঝাঁক— কত মাইল জল জুড়ে যে সাঁৎরে চলেছে ঝাঁকটা, আন্দাজ করতেই পারে নি কেউ—আজ দুইদিন ধ'রে ক্রমাগত পূর্বপানে চলেছে মেরীর পাশ দিয়ে। তোলো, তোলো, যত পার তুলে নাও বোটে।

বোটের বালক-ভৃত্যটি ছাড়া আর ছয়টি লোক ওরা মেরীতে, কাপ্তেনকে নিয়ে। তা কাপ্তেনও মাছ ধরেন। কেন ধরবেন না? সাধারণ জেলেরাই একদিন মাছ-ধরা বোটে কাপ্তেনি পায়, ছয় মাসের একটা ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারলে। গার্মিয়ারও সেইভাবে হয়েছেন কাপ্তেন, মাছ কেন ধরবেন না?

যাক, ছয়জন ধীবর, প্যালা ক'রে তিন তিন জন কাজ করে এক সাথে। এবারে যে তিনজন উপরে উঠল, তারা হ'ল ইয়ান, সিলভেস্টার, আর তাদেরই জেলার অন্য একটি ছেলে, গিলেউম নাম তার। তারা উপরে উঠল, বাকী তিনজন শয্যাগ্রহণ করল, এক একজন এক এক তক্তপোষে।

ছাদে বেরুতেই আলো, আলো। চিরন্তন আলো!

তবে আলোটা বিবর্ণ। কিসের মত বিবর্ণ? ঠিক তুলনা দেবার মত

কিছু নেই। একটুখানি কল্পনাশক্তি আছে যার, সে ভাববে এ-আলো কোন মরা-সূর্যের। জ্যান্ত-সূর্য থেকে এমন মরা-আলো আসতে পারে না।

শূন্য! শূন্যাকার সব চারিদিকে। অন্তহীন শূন্যতা, বর্ণহীন শূন্যতা! বোটের তক্তাগুলো ছাড়া সব কিছুকেই মনে হয় স্বচ্ছ, অস্পষ্ট, মায়াময়।

ওটা কী? সমুদ্র ছাড়া আর কী? কিন্তু চোখে ঠিক ঠাহর হয় না সে-সমুদ্র, নিতে হয় অনুমান ক'রে। একখানা বিরাট আয়না। সে-আয়না কাঁপছে ক্রমাগত। সে-আয়নায় ফুটে ওঠার মত ছবি কোথাও কিছু নেই। দীর্ঘ, দীর্ঘ, আরও দীর্ঘায়িত হতে হতে সে-আয়না ক্রমে কুয়াশাঘেরা এক মহাকান্তারে পরিণত হয়েছে। সে-কান্তারের পরে? না, পরে আর কিছু না। ওর কোন দিগন্তও নেই, পার্শ্বরেখাও নেই।

শীত? না। কিন্তু বাতাসে একটা আর্দ্রতা। যা পশমী জামা আর লোমশ চামড়া ভেদ ক'রে হাড় পর্যন্ত ভিজিয়ে দিতে চায়। নিশ্বাস নিতে গিয়ে বাতাসটাকে লাগে নোনা। হাওয়া পড়ে গিয়েছে, থেমে গিয়েছে বৃষ্টি। মাথার উপরে এলোমেলো মেঘের পুঞ্জ, তাদেরও বর্ণের অভাব। হঠাৎ কখনো এমন বিভ্রম হয় যে চারিদিকের এই যে বর্ণহীন সর্বব্যাপী আলোর পাথার, এর উৎসই বুঝি আকাশের ঐ বর্ণহীন মেঘের মালায়।

এই যে তিনটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বোটের ছাদে। এরা আবাল্য এই হিমমণ্ডলের সমুদ্রবক্ষেই বিচরণ করছে। অসীম ব্যাপ্তির কোলে অবিরাম এই পরিবর্তন। এ-জিনিস আর সাড়া জাগায় না তাদের অন্তরে। অতিকায় সামুদ্রিক পাখিদের মতই তারা এ-সবে উদাসীন এখন।

বোট দুলছে মৃদু মৃদু, একই করুণ তান বাজছে লহরে লহরে। সে-তান একঘেয়ে, স্বপ্নালু নাবিকের মুখে ব্রিটানির কোন গ্রাম্যগীতির মতই একঘেয়ে। ইয়ান আর সিলভেস্টার সুতো-বঁড়শি নামিয়ে ফেলেছে জলে। আর গিলেউম কাছে ব'সে আছে এক বস্তা লবণ নিয়ে। তার হাতে বড় একখানা ছোরা, তাতে সে ধার দিচ্ছে ক্রমাগত।

গিলেউমকে অপেক্ষা করতে হ'ল না। ইয়ানেরা বঁড়শি ফেলেছে কি না ফেলেছে, দ্রুতহস্তে আবার তা টেনে তুলেছে, ভারী ভারী দু'টো মাছ সমেত, মাছের গায়ে গায়ে ঝকঝক করছে ইস্পাতের মত সজীব শুভ্রতা। আরও, আরও, কড! কড! আরও কড! দ্রুত, অবিরত, নিঃশব্দ এই মাছ-ধরার আর শেষ নেই। গিলেউম তাদের পেট চিরে ফেলছে

ছোরা দিয়ে, চ্যাপ্টা করে ফেলছে হাতের চাপে, লবণ মাখাচ্ছে সারা গায়ে। তারপর ফেলে দিচ্ছে গাদায়। এই নুনে-জরানো মাছ থেকে আসবে সোনার মোহর, একবার ব্রিটানির উপকূলে পৌঁছোলে হয়।

ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে—একঘেয়ে! একঘেয়ে! চারিদিকের শূন্যতায় তখন পরিবর্তন এসেছে অনেক, আলোতে রং ধরেছে। এ-আলো এখন আর অবাস্তব, মায়ালোকের আলো ব'লে মনে হচ্ছে না। যাকে ধারণা হচ্ছিল গোধূলির মরা আলো ব'লে, রাত্রির ব্যবধান ব্যতিরেকেই তা এখন পরিণত হচ্ছে উষালোকে। মহাসমুদ্রের অগণিত দর্পণে প্রতিফলিত হ'তে হ'তে সে আলোক রক্তিম দ্যুতি নিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে সুদীর্ঘ রেখায় রেখায়।

দেহে শ্রান্তি, মনে অবসাদ। কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় এমন সঞ্জীবনী শক্তি আছে যে কাজ বন্ধ ক'রে বিশ্রাম নেওয়ার কথা এরা কেউ চিন্তা করছে না। এদিকে সকাল হ'ল। সত্যিকার আলোক বলতে যে জিনিসকে বোঝায়, তাই এসে উদ্ভাসিত ক'রে তুলল আকাশপট আর সাগরবক্ষ। অন্ধকার সব পুঞ্জীভূত হয়ে প'ড়ে আছে পশ্চিম দিগন্তের নীচে নির্বাসিত অন্ত্যজের মত। রাত্রি যে কেটে গিয়েছে, তারই জলজ্যান্ত সাক্ষী ওরা, ঐ কালো-কালো নীরন্ধ্র আঁধার, চক্রবাল রেখার গায়ে গায়ে। আকাশ মেঘে মেঘে ভারাক্রান্ত। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক এক জায়গায় ছেদ আবার। ঠিক যেন একটা গম্বুজের গায়ে চিড় খেয়েছে এখানে ওখানে। সেইখান দিয়ে চওড়া ধারায় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে এই নতুন আলো, লালের ছোপ-ধরা রূপোর স্রোতের মত।

নীচের স্তরে নেমে ঐ মেঘমালাই রচনা করেছে নিবিড় ছায়ার একটা কালো কটিবন্ধ। দৃশ্যমান জলরাশির চারিদিকে সে যেন এক বিশাল বৃত্ত, যার পরিধি ঘেঁষে ঘেঁষে এখনও টিকে রয়েছে বিগত রাত্রির জমাট বিষণ্ণতা। জেলেদের চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে সেই মেঘ। যেখানে কূল নেই, সেখানে দিচ্ছে উপকূলের আভাস, অসীমের বুকে জাগিয়ে তুলছে কাল্পনিক সীমারেখা। এ যেন এক কালো গুণ্ঠন, ওরই আড়ালে মেরুপ্রকৃতি যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে বিরাট বিরাট অজ্ঞেয় রহস্য, যা জানলে দুঃখের পরিধি বেড়েই যাবে মানুষের।

এই প্রভাত। কয়েকখানা কাঠ জোড়া দিয়ে তারই উপরে ভেসে

রয়েছে ইয়ান আর সিলভেস্টার আর তাদেরই কতিপয় বন্ধু। তাদেরই চারিদিকে বিশ্বজগতে আসছে আর যাচ্ছে শতেক পরিবর্তন। এই মুহূর্তে সেখানে নব রূপায়ণ ঘটেছে এক বিশাল প্রশান্তির। সে-প্রশান্তি স্নিগ্ধ রম্য পবিত্র তপোবনের, হিংসার তাণ্ডব যেখানে প্রবেশাধিকার পাবে না। আকাশ-গম্বুজের ফাটলে ফাটলে পরিস্রুত আলোর ধারা যেখানে জলতলের গভীরেও প্রতিফলিত হয়ে দীর্ঘতর, আরও দীর্ঘতর হতে হতে বিসর্পিত হবে গোপন পাতালে।

আবার পা'লটে যায় আকাশ সমুদ্র আলো আঁধারির রূপ। দূরে আর এক প্রপঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে খরতর দিবালোকে। গোলাপী আভায় মণ্ডিত মূর্তি একটি। আঁধার আইসল্যাণ্ডের কোন সমুচ্চ শৈলান্তরীপ।

সিলভেস্টার ভুলতে পারেনি ইয়ানের সেই কথা। রহস্যই অবশ্য। তবু সিলভেস্টারের মনে হয় অমন রহস্য করা ঠিক হয়নি ইয়ানের। সমুদ্রকে বিয়ে করা?

মাছের পরে মাছ উঠছে জাল থেকে। দু'খানা হাত এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায় না। ওদিকে বিশ্রাম পায় না তরুণ সিলভেস্টারের মনও। কত চিন্তা সেখানে।

গৌর! সুন্দরী গৌর! সিলভেস্টারের দিদি হয় দূর সম্পর্কের। তাদেরই বংশের মেয়ে ছিলেন ঐ গৌরের মা। পুরো নাম অবশ্য মার্গোয়ারেট। মার্গোয়ারেট মিভেল। ডাকে সবাই গৌর ব'লে। পেইম্পল বন্দরে বাড়ি। ইয়ানের সঙ্গে তাকে মানাবে ভাল। ইয়ান তাকে বিয়ে করবে, এ-কামনা সিলভেস্টারের অনেক দিনের। কেন? কারণ অতি সহজ ও সংক্ষেপ। কারণ এই যে ওদের দু'জনাকেই ভালবাসে এই সিলভেস্টার! এদের মিলন হয় যদি, এক বাড়িতেই সিলভেস্টার দেখতে পাবে তার যুগল ভালবাসার পাত্রকে। এই শুধু কারণ! আর কী!

ওদের বিয়ে হোক, এবং খুব তাড়াতাড়িই হোক। সিলভেস্টার ফরাসী নৌসেনায় ভর্তি হওয়ার আগেই হয়ে যাক। তা নইলে এমন আনন্দের ব্যাপারে ও যোগ দিতে পাবে না। পাঁচ বছর নৌবাহিনীতে কাজ করা ফরাসী নাগরিকমাত্রেরই পক্ষে আবশ্যিক। ইয়ান অল্পদিন আগে ফিরেছে সেখান থেকে। সিলভেস্টার অল্পদিন পরেই যাবে। পাঁচ বছরের জন্য।

ও-খাটুনি থেকে রেহাই কারও নেই। সিলভেস্টারকে যদি না যেতে হ'ত, ভালই হ'ত খুব। না, খাটুনিতে সে ভয় পায় না, ভয় পায় না মৃত্যুকেও। নিজের জন্য নয়, বুড়ী ঠাকুরমার জন্য। সোত্তর বছরের বুড়ী। অনেক-অনেক ছেলে মেয়ে ছিল, আজ ত্রিসংসারে সিলভেস্টার ছাড়া আর কেউ নেই তার। সব গিয়েছে এই সমুদ্রের গর্ভে। আইসল্যাণ্ডের উপকূলেই এক গির্জা আছে। গির্জার সংলগ্ন কবরখানায়—

না। কবর নয়। সমুদ্রেই ত সমাধি লাভ করেছে তারা। কবরখানায় আছে অনেক স্মৃতিফলক। মৃত ব্যক্তির নাম, বাসস্থান, আনুমানিক বয়স, মৃত্যুরও আনুমানিক তারিখ। জাহাজ যখন ডোবে, বহির্জগতে সে-ঘটনার সঠিক তারিখ কেউ জানতে পারে না।*

যা হোক, সেই কবরখানায় মোয়াঁ পরিবারের অনেকেরই স্মৃতিফলক গাঁথা আছে। সিলভেস্টারের ঠাকুর্দা গিলেউম মোয়াঁর, বাবা পিয়ের মোয়াঁর। আরও-আরও অনেকের।

হ্যাঁ, মরেছে তারা সকলেই। জাহাজডুবি হয়ে। সিলভেস্টারও হয়ত তাই মরবে। তাতে ভয় নেই। নৌবাহিনীতে থাকতে থাকতেও মরতে পারে হয়ত। ভয় তাতেও নেই। তবু নৌবাহিনীতে সিলভেস্টারকে যেতে না হ'লে ভাল হ'ত। এখন সে বছরে চার মাস মাছ ধরে সমুদ্রে, বাকী আট মাস ঠাকুরমার কাছেই কাটায়। আর নৌবাহিনীতে যখন যাবে—

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঠাকুরমা দেখতে পাবে না সিলভেস্টারকে, তার অন্ধের নড়িটিকে। তখন কী যে অবস্থা হবে তার, ভাবতে গেলেই কান্না পায় ছেলেটার। এই ঠাকুরমা আর এই নাতি। যাদের আপনজন আর কেউ নেই পৃথিবীতে, তাদের এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ বড় মর্মান্তিক, বড় নিষ্ঠুর। যারা রাজ্যশাসন করে, তারা এই সোজা কথাটা বোঝে না কেন?

ভোর চার'টে। নীচে ঘুমোচ্ছিল যারা তিনজন, সবাই এবার উঠে এল এদের বিশ্রাম দেবার জন্য। এখনো ঘুম তাদের চোখে জড়ানো।

---

* এ হ'ল সেকালের কথা। আধুনিক যুগে অবশ্য অবস্থা সম্পূর্ণ পা'লটে গিয়েছে।

ভোরের তাজা ঠাণ্ডা বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। উপরে উঠতে উঠতেই হাঁটু-পর্যন্ত-তোলা বুটের ফিতে বেঁধে নিয়েছে। এখন উপরের এই আলোর ঝলকে চোখ তাদের মিটমিট করছে।

এইবার ইয়ান আর সিলভেস্টার প্রাতরাশ সেরে নিল খানকতক বিস্কুট চিবিয়ে। এত শক্ত যে পাথর হার মেনে যায় সে বিস্কুটের কাছে। হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়ে তবে তা মুখে দিতে হয়। হাতুড়ি পেটে আর হাসে দু'জনে। খুব আনন্দ। এইবার ঘুমোতে পাবে তারা। লম্বা ঘুম। গাঢ় ঘুম। সরু সরু তক্তপোষে আরামে শুয়ে ঘুম। ভারী ভারী কম্বল চাপা দিয়ে। গলা জড়াজড়ি ক'রে দু'জনে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, পুরোনো একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। দু'জোড়া গোদা পা নেচেও নিচ্ছে দুই এক কদম সেই সুরের তালে তালে।

কাপ্তেনের পিছনে পিছনে বোটের কুকুরটাও উঠে এসেছে। তুর্কী তার নাম। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বনেদি বংশের সারমেয়। বয়স এখনও কম, কিন্তু আকারে এর মধ্যেই বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পায়ের থাবাগুলো ত বাঘের পায়েরই মত প্রায়। ইয়ানেরা তাকে আদর করল একটুখানি। তারপর তার পাল্‌টা-আদর থেকে আত্মরক্ষা করা দায় হয়ে দাঁড়াল ওদের। হাত চাটতে গিয়ে কামড়ে দিচ্ছে। ইয়ান তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ঠেলাটা একটু জোরেই দিয়েছে বুঝি। কুকুরটা গড়িয়ে গিয়ে দূরে পড়ল আর্তনাদ ক'রে।

মনটা ওর ভাল, এই ইয়ানের। কিন্তু স্বভাবটা কেমন যেন বুনো। অনেক সময় ওর আদরের ছোঁয়াও আঘাতের মত লাগে অন্যের গায়ে।

২

"মেরী" হ'ল বোটের নাম, গার্মিয়ার তার কাপ্তেন। এই হিমমণ্ডলের সমুদ্রে প্রতি বছরই এ-বোট মাছ ধরতে আসে। গ্রীষ্মের দিনে এখন চব্বিশ ঘণ্টাই দিন, রাত ব'লে কিছু নেই।

বোটখানা অতি পুরোনো। এর গৃহদেবতা ঐ মৃন্ময়ী মেরীর মতই পুরোনো। দেয়ালগুলো ভীষণ পুরু। তার গায়ে গায়ে ওক-কাঠের

বাটাম বসানো। জীবদেহে পাঁজরার মত। কতকালের ঘষায় ঘষায় এসব দেওয়াল খসখসে হয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে বাইরের দিকে। তবু আজও এ-বোট দারুণ মজবুত আর শক্ত। আলকাতরার গন্ধ ভকভক ক'রে বেরুচ্ছে এর গা থেকে। নোঙ্গর ফেলে আছে যখন, দেখতে এটা রীতিমত বিশ্রী জরদ্গব। কিন্তু পশ্চিমা হাওয়া যখন জোরে বইতে শুরু করে, মেরী তরতরিয়ে এগিয়ে যায় ঝড়ের মুখে ঝোড়ো পাখির মত। মেরীর গতির ছন্দ দেখলে তখন তাক লেগে যায়। কেমন অবলীলায় বেয়ে উঠছে বড় বড় ঢেউয়ের মাথায়। তারপর ক্ষিপ্রবেগে লাফিয়ে নামছে সেখান থেকে একান্ত নিরাপদে! আধুনিক কায়দায় গড়া একেলে বোটের তা হিংসার বস্তু।

মেরীর নাবিকেরা সবাই পাকাপোক্ত আইসল্যাণ্ডিয়া। নাবিক হলেই বা ধীবর হলেই আইসল্যাণ্ডিয়া হওয়া যায় না। ও-একটা বিশেষ গোষ্ঠী আছে জেলেদের সমাজে, পেইম্পল-ট্রিগিয়ার অঞ্চলের আবহাওয়াতেই যাদের বাড়বাড়ন্ত দেখতে পাওয়া যায়, পুরুষানুক্রমে তারা আইসল্যাণ্ডিয়া। বাপ ডুবে মরল যদি সমুদ্রে, ছেলে গিয়ে বোটে চড়ল তার শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্য।

গ্রীষ্মঋতু তাদের আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রেই কাটে। ফরাসী দেশটা জুড়ে সেই গ্রীষ্মে কী উৎসবে মেতে ওঠে প্রকৃতি, ফুলের গন্ধে, সবুজের সমারোহে, নির্মেঘ আকাশে বিহঙ্গের কলঝঙ্কারে কী মোহনিয়া মূর্তি তখন ধারণ করে বসুন্ধরা, তা এই আইসল্যাণ্ডিয়াদের ভিতরে অনেকেই কখনো চোখে দেখেনি!

শীত যেই কাটল, 'সাজ সাজ' রব প'ড়ে গেল পেইম্পলে। এবার যারা সমুদ্রযাত্রা করবে, একটা আধা-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে দিল দেশের লোক। পেইম্পলের বন্দরে জলের ধার ঘেঁষেই একটা পূজাবেদী গ'ড়ে তোলা হ'ল, তার আকার অনেকটা পাহাড়ের গায়ের গুহার মত। তারই ভিতরে দাঁড়, নোঙ্গর আর মাছ-ধরা জাল দিয়ে রচিত পরিবেশে স্থাপিত হয় মেরীমাতার মূর্তি। এই বিশেষ উপলক্ষে স্থানীয় গির্জা থেকেই এ-মূর্তি একদিনের জন্য ধার ক'রে আনা হয়। কারণ এই দেবীই হ'চ্ছেন সমুদ্রযাত্রী ধীবরদের রক্ষাকর্ত্রী।

বৎসরের পরে বৎসর ঐ একই দেবীর নিষ্প্রাণ দৃষ্টি ধীবরদের মনে

সাহস আর উদ্দীপনার সঞ্চার করে। গ্রীষ্ম-অন্তে যারা নিরাপদে ঘরে ফিরল, তারা দেবীর সমুখে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এল, গির্জায় কয়েকটা মোম জ্বালিয়ে। আর যারা ফিরল না, তারা—

আর যাই হোক, তারা ত আর নালিশ জানাবার জন্য গির্জায় হানা দেবে না!

কিন্তু সেকথা যাক। প্রতিবৎসরই এই আধা-ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় দেবীকে কেন্দ্র ক'রে। পবিত্র বাইবেলকে মস্তকে নিয়ে আগে আগে চলেন কোন যাজক, তাঁর পিছনে চলে একটা মন্থর মিছিল, তাতে থাকে ধীবরদের মাতা ও পত্নীরা, বোনেরা ও প্রণয়িনীরা। মিছিল সমস্ত বন্দরটাই পরিক্রমা করে। প্রত্যেকটা জেলে-বোটকেই কূলের কাছে এনে ফুলে-পাতায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বোটের সামনে মিছিল থামে, প্রত্যেক বোটকেই আশীর্বাদ জানান যাজক। তারপর বোটগুলি একে একে দরিয়ায় ভেসে যায়, ছোটখাট নৌবহর একটা। পিছনে রেখে যায় বিরাট এক শূন্যতা। গৃহে গৃহে স্ত্রীদের স্বামী নেই, মায়েদের পুত্র নেই, নবপ্রণয়বিধুরা আজ বিরহিনী, তার প্রিয়তম অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে দীর্ঘদিনের জন্য। নারীমাত্রেরই আজ এক কাজ এ-অঞ্চলে, স্মৃতি-চারণ আর অশ্রুমোচন।

বহর ভেসে যায়, বিশখানা বোট থেকে ঐকতানে স্তোত্রগান ওঠে শতকণ্ঠে, মেরীমাতা সমুদ্রদেবীর উদ্দেশে। জলের রাজ্যে বিপদে বিপর্যয়ে তুমিই রক্ষা কর মা!

প্রতি বছর এই একই অনুষ্ঠান, প্রতি বছর একই বিদায় সম্ভাষণের বিনিময় আপনজনেদের সাথে। তারপর মহাসমুদ্রের বুকে নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু। নিঃসঙ্গ জীবন, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগশূন্য তিন বা চা'রজন অমার্জিত কঠোর পুরুষের একঘেয়ে অক্লান্ত চেষ্টা একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে। ধর মাছ! ধর মাছ! চা'র মাস ধ'রে ধরতেই থাকো। বিশ্ব-গোলকের উত্তরতম সমুদ্রের হিমশীতল জলের বুকে ভাসমান দারুগৃহের অনিশ্চিত আশ্রয়ে বসে বঁড়শি ফেলো আর বড় বড় মাছ গেঁথে তোলো।

এ-যাবৎ "মেরী" নিরাপদেই ফিরেছে বরাবর। সমুদ্রদেবী মেরীমায়ের বিশেষ করুণা তাঁর নিজের নামাঙ্কিত এই জলযানখানার উপরে, কোন বিপদই এতদিন স্পর্শ করে নি তাকে।

ওরা ফিরে আসে আগষ্টমাসের শেষে। আসে, পেইম্পল বন্দরে একবারটি থামে, শুধু আত্মীয়দের সঙ্গে একবারটি দেখাশোনা করার জন্য, তারপরই আবার বোট খুলে চ'লে যায়। এবার উত্তর পানে নয়, দক্ষিণের গ্যাস্কনি উপসাগরের দিকে। সেখানে মাছের জোর কেনা-বেচা। গেলেই জাহাজশুদ্ধ মাল লুফে নেবে আড়তদারেরা। সব বোটই চিরদিন ওখানে যাচ্ছে, মেরীও তাই।

মাল যদি খালাস হ'ল, তখনও ছুটি নেই। যেতে হবে আগামী সালের জন্য লবণের সন্ধানে। কতকগুলি দ্বীপ আছে এই উপসাগরেই, যাদের জলাভূমিতে অঢেল লবণ মিশে আছে বালিতে। ওরা অবশ্য বালি থেকে লবণ নিষ্কাশনের জন্য যায় না সেখানে; যা নেয়, তা কারখানা থেকে কিনেই নেয়।

দক্ষিণের ঐ গ্যাস্কনি উপসাগরের বন্দরে বন্দরে, গ্রীষ্মঋতু পেরিয়ে গিয়েছে যদিও এখনও কী ঝলমলানি সেখানে রোদ্দুরের! বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে মেরুসূর্যের মরা আলো যারা চারমাস ধরে নিরীক্ষণ করেছে, তাদের রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয় এ-রোদ্দুর। গরম রোদ্দুর! তাজা রোদ্দুর! পৃথিবীর রং ফিরিয়ে দেওয়ার মত রোদ্দুর! জেলের দল চা'র মাসের সংযম হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয় সেই রোদ্দুরে। বোটের ভিতর লবণ তুলতে অহেতুক দেরী করে।

কিন্তু কয়দিন আর? তাদের চোখের সামনেই সে রোদ্দুরের তেজ নিবে আসে দিনে দিনে। হেমন্তের কুয়াশা দেখা দেয় আকাশের কোণে কোণে। ঘরে ফেরার সময় হ'ল। চল যাই পেইম্পলের গৃহকোণে, কিংবা গোয়েলো অঞ্চলের গাঁয়ে-গাঁয়ে কুঁড়ে ঘরের পাথর-ছাওয়া অঙ্গনে, দিন-কতক গেরস্তালির আনন্দ উপভোগ ক'রে নেওয়া যাক সামাজিক জীবের ভেক ধ'রে।

যারা বিবাহিত, ইতিমধ্যে তাদের পরিবারে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, নবজাতকের আবির্ভাবে। এবার গির্জায় নিয়ে শিশুর পুণ্যস্নান আর নামকরণের ব্যবস্থা করা চাই। পিতার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় মুলতুবি রয়েছে ওটা। আসুক! শিশুরা দলে দলে আসুক। ধীবর জা'তের

সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া একান্তই দরকার। ওদিকে যে আইসল্যাণ্ডের সমুদ্র মুখব্যাদান ক'রে আছে ফী বছরই দুই এক ডজনকে গ্রাস করার জন্য।

* * *

গল্প শুরু হয়েছিল ইয়ান আর সিলভেস্টারকে নিয়ে। ওরা তখন মাছ ধরছে "মেরী" বোটের ছাদে ব'সে। আইসল্যাণ্ডদ্বীপের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় সমুদ্রে।

তারই কিছুদিন পরে, জুন মাসের এক নির্মেঘ অপরাহ্নে পেইম্পলের এক ধনীগৃহের বাতায়নে ব'সে আছে দু'টি নারী। চুপ চাপ বসে নেই। একখানা চিঠি লিখছে দু'জনে মিলে। একজন বলে যাচ্ছে, অন্যজন লিখে যাচ্ছে।

জানালাটা বেশ বড়। গ্রানাইটের গোবরাটের উপরে কয়েকটা ফুলের টবও বসানো আছে। জানালা-ঘেঁষা টেবিলের উপরে ঝুঁকে রয়েছে দু'টি নারী। পিছন থেকে দেখলে উভয়কেই অল্পবয়সী মনে হবে। একজনের কান-ঢাকা টুপিটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। আগেকার দিনে এইরকম টুপি পরাই দেশাচার ছিল। অন্যজনের টুপিও ঐ জাতীয়ই, তবে আধুনিক রীতি-অনুযায়ী এর আকার খুব ক্ষুদ্র। যে-রকম গায়ে গা মিশিয়ে এরা ব'সেছে, তাতে খুব ঘনিষ্ঠ ব'লেই মনে হয় এদের। দু'জনে মিলে পরামর্শ ক'রে ক'রে লিপিরচনা করছে কোন সুদর্শন আইসল্যাণ্ডিয়ার উদ্দেশে।

চিঠির বয়ান যার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল, সে এবার মাথা তুলল, একটু ভেবে মনের কথা গুছিয়ে নেবার জন্য। মাথা তুলতেই তার মুখ দেখা গেল। অবাক কাণ্ড!

এ যে বুড়ী একটা! থুনথুনে বুড়ী ঠাকুরমা পর্যায়ের! অন্তত সত্তর বছর বয়েস! তবে একথা ঠিক, এক ধরনের সৌন্দর্য এ-বুড়ীর মুখশ্রীতে এখনও বজায় রয়েছে, গাল দু'টো এখনও গোলাপী, তাজা রক্তের জৌলুষ চেহারায়। আছে, অনেক বুড়োবুড়ীর বিলক্ষণ জানা আছে—এই তাজা ভাবটা দেহে মনে কী ক'রে টিকিয়ে রাখা যায়। তার কান-ঢাকা টুপিটা দুই তিন ভাঁজের মসলিনে তৈরী। এক ভাঁজের ভিতর থেকে নেমেছে আর এক ভাঁজ, কাঁধটা পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে শেষ ভাঁজের নীচে সাদা মসলিনে। ঘেরা মুখখানাতে আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়েছে একটা পবিত্রতার আভাস,

যে দেখে সেই শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে দেখে। দু'চোখ থেকে স্নেহ উপচে পড়ছে সর্বসাধারণের জন্য। অথচ সেই চোখের দৃষ্টিই সবাইকে স'মঝে দিচ্ছে—এ-বুড়ী নেহাৎ হেলা ফেলার পাত্রী নয়।

বৃদ্ধা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, নাতিকে আর কী লেখা যায়, ভাবছেন তাই। সাধারণতঃ তাঁর চিঠিগুলি দীর্ঘই হয়, দীর্ঘ অথচ রসালো। এত মজার মজার গল্প এর ওর তার সম্বন্ধে—হয়ত বা কোন কিছুর সম্বন্ধেই না—তিনি ঢুকিয়ে দেন চিঠির ভিতর। যে পায় সে চিঠি, একবার দুইবার প'ড়ে তৃপ্ত হ'তে পারে না, অন্তত দশবার পড়তে বাধ্য হয়, বন্ধুদের ডেকে ডেকে প'ড়ে শোনায় নিজের তাগিদেই। হাতের এই চিঠিখানাতেই এইরকম তিন তিনটি সরস গল্প তিনি শুনিয়ে দিয়েছেন নাতিকে, এখন ভাবছেন আরও কিছুর ঠাঁই এর ভিতর হ'তে পারে কি না।

লেখিকাটি লক্ষ্য করেছে বুড়ীর আনমনা ভাব। আর কিছু ওঁর বলবার নেই যে, তাও বুঝতে পেরেছে। এইবার সে সযত্নে ঠিকানাটি লিখতে শুরু করল—"মসিয়ঁার মোয়াঁ, সিলভেস্টার, সমীপে। "মেরী" বোটের নাবিক। কাপ্তেন গার্মিয়ারের বোট। আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে। রিকিয়াভিক ডাকঘরের মারফৎ।"

লেখা শেষ ক'রে সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল—"এইত সব, মোয়াঁ ঠাকুরমা?"

এই লেখিকাটি তরুণী, মোহিনী-তরুণী যাকে বলে, তাই। মাত্র বছর কুড়ির তরুণী টকটকে ফর্সা। ব্রিটানি প্রদেশের এই অংশে নারীরা এত ফর্সা হয় না সাধারণতঃ। এখানকার বেশীর ভাগ গায়ের চামড়াই একটু ঘোলাটে বর্ণের। হ্যাঁ, মেয়েটি অত্যন্তই ফর্সা; ধূসর-বেগুণে চোখের পাতা-গুলি কালোই প্রায়। চুল কিন্তু সোনালি, এবং ভ্রূও। দুই ভ্রূর মাঝখানে কিছু চুল আবার গাঢ় লাল। তারই দরুণ আশ্চর্য এক কর্মশক্তি আর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার আভাস ফুটে উঠেছে—সারা মুখখানাতে। নাসিকা গ্রীসীয়, কপালের সমানই উঁচু, লম্বা এবং ঋজু। নীচের ওষ্ঠের নীচে একটি গভীর টোল।

তনুদেহের সকল প্রত্যঙ্গ দিয়ে একটা জিনিসই বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওর, সেটি তার আত্মমর্যাদা। ওর পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিল আইসল্যাণ্ডিয়া, তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ও লাভ করেছে একটা অসাধারণ

চারিত্রিক দৃঢ়তা। চোখের দৃষ্টি থেকে যুগপৎ উৎসারিত হয় ওর একগুঁয়েমি আর ওর কোমলতা।

ঐ বৃদ্ধাকে ঠাকুরমা বলে সম্বোধন করেছে এই তরুণী। ঠাকুরমা অবশ্য দূরসম্পর্কেরই। এককালে ওদের অবস্থাও ভাল ছিল খুবই। এখন রীতিমত দৈন্যদশায় পড়েছে পরিবারটা। অবশ্য পরিবার বলতে এখন দু'টি প্রাণীতে এসে ঠেকেছে। আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে একজন মাছ ধরছে এখন। আর তারই জন্য দুশ্চিন্তায় জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছে পেইম্পলে এই বুড়ী।

সে কথা যাক, পাশাপাশি এই দুইজনকে যে দেখবে, এক নজরেই একটা জিনিস উপলব্ধি হবে তার। সেটা এই যে একধারার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় এরা দু'টিতে। বস্তুতঃ মসিয়ঁার মিভেলের এই মেয়েটি শৈশব থেকেই মানুষ হয়েছে প্রাচুর্য্য আর ঐশ্বর্যের পরিবেশে। ওর বাপ মিভেল প্রথম জীবনে আইসল্যাণ্ডিয়াই ছিলেন অবশ্য, কিন্তু শেষ দিকে মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে উনি কী যে ক'রে বেড়িয়েছেন সমুদ্রে সমুদ্রে, তা কেউ সঠিক জানে না। কেউ কেউ বলে যে সেটা জলদস্যুতা। সে অপবাদ সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, এটা নিশ্চিত যে বর্তমানে তিনি যথেষ্ট অর্থের মালিক।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেয়ে মাগু'য়ারেটকে উনি প্যারিতে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। সম্ভ্রান্ত সমাজে চলা-ফেরার উপযোগিনী ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন ওকে। শেষ অবধি ওকে প্যারিতে রেখে সেই সমাজেই ওর বিয়েটা যদি দিয়ে দিতেন, ভালই হ'ত সেটা। কিন্তু মিভেল মানুষটি একাধারে খেয়ালী ও একগুঁয়ে, প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েই ওঁর প্রবল ঝোঁক হ'ল—এবার নিজের দেশে গিয়ে উনি বসবাস করবেন মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়েই। পেইম্পলের কেন্দ্রস্থলে গ্রানাইটের দ্বিতল বাড়িও কিনে ফেললেন একটা।

কী জানি কেন, এ-বন্দোবস্ত মোটেই অপছন্দ হ'ল না গৌর ওরফে মাগু'য়ারেটের। সে বরং প্যারির বিলাসের জীবনকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ধন্যবাদই জানা'ল বাবাকে। প্রথম শৈশবের কথা সে আজও ভোলে নি। সমুদ্র সৈকতে হ'লদে বালির উপর কচি কচি পায়ে যখন সে ছুটে ছুটে বেড়া'ত সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, একটা ঝিনুক বা একটা রং-বেরঙ্গা নুড়ি কুড়িয়ে পেলে কলহাস্যে উচ্চকিত

ক'রে তুলত জেলে ডিঙ্গির মাঝিমাল্লাগুলিকে, সে-দিনের মধুমাখা স্মৃতি আজও গাঁথা আছে তার মনের মালায়। পেইম্পলে ফিরে যাবার নামে তাই আহ্লাদে নেচে উঠল গৌর। বিলাসের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে যেন সে কান্নাহাসির পাঁচমিশেলি পৃথিবীতে ফিরে এল। সিংহাসন থেকে নেমে যেন বসল গিয়ে মায়ের কোলে আবার!

এই ঘরখানি তারই ঘর, যাতে বসে সে মোয়াঁ ঠাকুরমার চিঠিখানি লিখে দিয়েছে। চমৎকার ঘর। প্যারিশহরে বড়ঘরের মেয়েরা হাল-ফ্যাশানের যে-রকম পালঙ্কে যে-ধরনের বিছানায় শয়ন করে, ঠিক তেমনি পালঙ্ক আর তেমনি বিছানা গৌরেরও আছে এই ঘরে, মসলিনের মশারি দিয়ে ঘেরা সে-শয্যা, সে-মশারির ঝালরে লেস্ আবার। গ্রানাইটের দেওয়াল ঠিক মসৃণ নয়। তবু তার উপরে হাল্‌কা সোনালি কাগজ লাগানো। ছাদে চুনকাম হয়েছে। বাড়িটার প্রাচীনত্বের নিদর্শন ঐযে মোটা মোটা কড়িকাঠগুলো, ওদেরই ধূলিমলিন নোংরা চেহারা ঢাকবার জন্য। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে আদর্শ বাসগৃহ একটা। জানালার নীচেই পেইম্পালের পুরোনো পার্ক, বাজার এখানেই বসে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও এইখানেই হয়ে থাকে।

"কী বল ইভোন ঠাকুরমা, আর কিছু ত লিখবার নেই?"—অবশেষে গৌর জিজ্ঞাসা করল একসময়। বুড়ীর ডাক-নাম ইভোন, ও-নামে ডাকবার মত আত্মীয় ওর আর বেশী নেই এখন।

"না গো দিদি, তবে ভাল কথা, লিখে দিতে পার যে গেয়সদের ছেলেটিকে আমি আশীর্বাদ জানাচ্ছি—হ্যাঁ, ইয়ান! ইয়ান তার নাম! ইয়ান গেয়স!"

নামটা লিখতে গিয়ে গৌরের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল কেন? লেখাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে সে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল, বুড়ীর চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য।

ও উঠে দাঁড়াবার পরে এখন মালুম হচ্ছে বেশ লম্বা ও। শহুরে মহিলাদের মতই তারও সুগঠিত উর্দ্ধাঙ্গে আঁটো জামা একটা। পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের নিজস্ব জিনিস ঐ কানঢাকা টুপি তারও মাথায় আছে অবশ্য, তবু ওর চেহারার আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। বড় ঘরের মেয়েদের করপল্লব হয় ছোট আর নরম। গৌরের হাত তত ছোট নয় অবশ্য,

কিন্তু নরম তবু। এবং কোমল শুভ্র। ঘরকরণার নোংরা কাজ করতে হয় নি কোনদিন, কাজেই সে-হাতে কর্কশতাও আসেনি একটুও।

গৌরের সবই মনে আছে আগের দিনের কথা। বাবা ছিলেন তখন আইসল্যাণ্ডিয়া। বোটে চড়ে সমুদ্রে চলে যেতেন চা'র ছয় মাসের জন্য। মাকে একদম মনে পড়ে না। জন্মের পরেই গৌর তাঁকে হারিয়েছিল। তাই মিভেল সমুদ্রযাত্রার সময়ে প্রতিবারই এই মোয়াঁ ঠাকুরমার হেফাজতে রেখে যেতেন গৌরকে। একটুখানি দূরসম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন আছে ওঁর সঙ্গে, সেই সুবাদে।

ইভোন বুড়ী তখনও বুড়ীই ছিলেন, এত পাকা বুড়ী যদিও নয়। কাজকর্ম করতে পারতেন, করতেও হ'ত। পেট চালাবার জন্যই। অনেক ছেলে ছিল, একে একে সবাইকে কেড়ে নিয়েছে আইসল্যাণ্ডের সমুদ্র। শেষ সন্তান পিয়ের, সেও গেল শেষ পর্যন্ত, একটিমাত্র মাতৃহীন শিশুকে রেখে। সেই শিশুই আজকের ঐ সিলভেস্টার, যার কাছে চিঠি লেখা হ'ল এইমাত্র।

কাজে বেরুতেন ইভোন বুড়ী, এই গৌরের জিম্মাতেই সিলভেস্টারকে রেখে। যদিও গৌর ওর চাইতে মাত্র বছর দুইয়ের বড়। আর বাচ্চা গৌর ততোধিক বাচ্চা ছেলেটাকে তখন কী যত্নে টেনে টেনে নিয়ে বেড়া'ত হাত ধ'রে ধ'রে! আর দু'জনকে একসাথে মানা'ত কী সুন্দর! গৌর ফর্সা, সিল্‌ভা একটু বাদামী রং। গৌর চটপ'টে আর খেয়ালী, সিল্‌ভা একান্ত নিরীহ, একান্ত ন্যাওটো।

পরবর্তী জীবনে ঐশ্বর্যের আস্বাদ পেয়েছে গৌর, মুগ্ধ হয়েছে মহানগরীর বিবিধ বর্ণাঢ্য আকর্ষণে। বেশ কয়েক বৎসর বাসও করেছে প্যারিতে।

যদিও তার সে-প্রবাস জীবনে ছেদও পড়ত বছরে একবার ক'রে। প্রতি বছরই ব্রিটানির এই সাগরকূলে একবার ক'রে হানা দেওয়ার একটা নিয়ম বেঁধে নিয়েছিলেন মিভেল। অন্ততঃ দুই এক হপ্তার জন্য গৌর প্রতিবছরই এসেছে পেইম্পলে।

তারপর একদিন, এই গত বছরই একদিন, তার বাবা তাকে উড়িয়ে এনে ফেললেন এই পুরোণো পেইম্পলে আবার। দুই এক হপ্তার জন্য নয়, একেবারে চিরদিনের তরে। ডিসেম্বরের এক প্রভাতে প্যারির ট্রেন

তাদের পিতাপুত্রীকে নামিয়ে দিয়ে গেল গুঁই শাম্প স্টেশনে। কী ঠাণ্ডা সেদিন! আর কী কুয়াশা! এক অভূতপূর্ব বিষণ্ণতা সেদিন জুড়ে বসেছিল তার অন্তরকে।

আগের আগের বার ত এমন হয় নি! যখন গরমের দিনে দুই হপ্তার ছুটি ভোগ করার জন্য সে আসত জন্মভূমিতে! তখন যে আশা থাকত, দু-হপ্তা পরে আবার ফিরে যাওয়া যাবে প্যারির স্বর্গে! এবার কিন্তু পরিস্থিতি আলাদা! চিরতরে—চিরতরে এই অন্ধকার গ্রাম্য পরিবেশে, এই দুর্জয় বারোমেসে শীতের দেশে—

হঠাৎ এ কী! এত শীতে এমন সবুজের সমারোহ কোথা থেকে আসে? খুবই একটা চমক লেগেছিল গৌরের। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে আছে দেখে মিভেলই বুঝিয়ে দিলেন—ঐ গর্স গাছের কাঁটা ঝোপ কখনো বিবর্ণ হয় না। বারো মাস বজায় থাকে ওদের সবুজ শোভা।

গৌর সেদিন অতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁটাঝোপের চিরহরিৎ সৌন্দর্য দেখেছিল। পাহাড়ের গায়ে, খাদে খন্দে, বাড়ির উঠোনে, গলিপথের দুই পাশে, কোথায় তারা নেই? ডিসেম্বরের শীতও তারা সহনীয় করে তুলেছিল সেদিন গৌরের পক্ষে।

ঐ চিরহরিতের সুষমার সঙ্গে আবারও এসে যোগ দিয়েছিল আর এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ। সমুদ্র থেকে যে হাওয়াটা এসে আছড়ে পড়ছে গৌরের গায়ে, তা মোটেই ঠাণ্ডা নয়। এ যেন বসন্ত-বাতাসেরই মত উষ্ণ কোমল সুখস্পর্শ! হঠাৎ মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল গৌরের। সুখেই থাকবে সে এখানে।

সুখে না থাকবার কারণই বা কী? নতুন জিনিস একটা সে দেখতে পাবে এবার পেইম্পলে। প্রতি বৎসরই সে এখানে এসেছে একবার ক'রে। কিন্তু তা গ্রীষ্মের দিনে, যখন সুদর্শন আইসল্যাণ্ডিয়া যুবকেরা সবাই গর-হাজির থাকে পেইম্পল থেকে। প্রতিবারই এখানে এসে গৌর শুনেছে—ওরা এই ত গত হপ্তায় বেরিয়ে গেল নৌকার বহর সাজিয়ে।

এবার কিন্তু আর গৌর ফাঁকি পড়ছে না। ভরা শীতে এখন ত ওরা পেইম্পলেই আছে! এখনও থাকবে অন্ততঃ চার মাস। এবার গৌর দেখবে তাদের। গল্পের মত যাদের শক্তি-সামর্থ্য-বীরত্বের গাথা এ-অঞ্চলে

লোকের মুখে মুখে ফেরে, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের পরিচয় সে পাবে এবার। একটা উত্তেজনার শিহরণ গৌর অনুভব করছে শিরায় শিরায়।

আজ ঠাকুরমা ইভোন পত্র শেষ করেছেন "গেয়সদের সেই ছেলেটার" কথা দিয়ে। ইয়ান! গেয়সদের সেই ছেলেটাই ইয়ান। একে দেখেছে গৌর। দেখার পরে ভুলতে পারে নি আর। কাজেই চিঠিতে ঐ শেষ ছত্রটুকু সংযোগ করতে গিয়েই মুখখানি লাল হয়ে উঠল তার। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল কয়েকবার।

বেশী দিন দেরী হয় নি। পেইম্পলে যেদিন এল গৌর, তার পরের দিনই দেখতে পেয়েছিল সব আইসল্যাণ্ডিয়ার সেরা আইসল্যাণ্ডিয়া ঐ ইয়ানকে। ৮ই ডিসেম্বর তারিখ। প্রতি বছর ঐ দিনে একটা উৎসব হয়। ধীবরদের উপাস্যা দেবী, নাম তাঁর সুসমাচারের দেবী, তাঁরই পূজার দিন ওটা। মিছিলটা সবে পেরিয়ে গিয়েছে গৌরদের বাড়ি, রাস্তায় তখনো সাদা ঝালরে আইভি আর হোলির গুচ্ছ, শীতঋতুর নিজস্ব পত্র পুষ্পের অর্ঘ্য, ঝোড়ো হাওয়ায় দুরন্তবেগে দুলছে। সেই সময় ইয়ানকে দেখল গৌর।

আনন্দ উদ্দাম। এই ৮ই ডিসেম্বরের পূজায়। আকাশ বিষণ্ণ, বাতাস কনকনে। এই নিরানন্দের পরিবেশকে নিজেদের জান্তব উন্মাদনায় দাবিয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়েই আইসল্যাণ্ডিয়ারা যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেপরোয়া হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। গায়ের জোর দেখায় কারণে অকারণে।

কলরব কোলাহল চারিদিকে। ঘণ্টা বাজে অবিরাম, যাজকেরা স্তবগান করে তারস্বরে।

চারিধারে প্রাচীন সব গ্রানাইটের বাড়ি, তাদেরই বেষ্টনীর ভিতরে মেয়ে-পুরুষের এই ভিড়। প্রাচীন ছাদগুলিতে প্রকট শতাব্দীকালের ঝটিকা-তাণ্ডবের আঘাতচিহ্ন, বৃষ্টিকুয়াশায় যুগে যুগে সঞ্চিত শ্যাওলার দাগ। এই বাড়ির ভিতরে, এই ছাদের উপরে, কত না দুঃসাহসী আইস-ল্যাণ্ডিয়ার অঙ্গস্পর্শ এখনও অলক্ষ্যে মিশে আছে।

পার্কে খেলাধূলো চলছে, বেদে-বাজিকরেরা চমকপ্রদ ভেল্কি দেখাচ্ছে নানারকম। তারই ভিতর দিয়ে দিয়ে কতকগুলি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গৌরও। এসব মেয়ে তার শৈশবের সখী, এখন

অনেকখানি দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে স্বভাবতঃই। তবু এদের সঙ্গে ছাড়া গৌর মিশবে অন্য কার সাথে? আর এরা ছাড়া এই পেইম্পলের সমাজজীবনের সঙ্গে গৌরকে পরিচিতই বা করিয়ে দেবে কারা?

তা পরিচিত ক'রে দেওয়ার কর্তব্য এরা ভালভাবেই ক'রে যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে যত তরুণ চোখে পড়ছে, প্রত্যেকের নাম ধাম ওকে বাৎলে দিচ্ছে। এর বাড়ি এই পেইম্পলেই, ওর কিন্তু প্লাউবাজলানেক। এ-শহরের বাইরে ঐ যে পাহাড় দেখা যায়, ওরই উপর গ্রাম আছে পর পর। প্রথমে হ'ল ঐ প্লাউবাজলানেক, তারপর পর্স-ইভেন, তারপর—

এক জায়গায় গান গাইছে কিছু গেঁয়ো লোক, গানের বিষয়বস্তু অবশ্য স্থানীয় আইসল্যাণ্ডিয়াদের বীরত্বকাহিনী। সেইখানে, গায়কদের ঘিরে কতকগুলি যুবা, গান যত না শুনুক, টিপ্পনি কাটছে শতমুখে। মেয়েদের দিকে পিছন ফিরে এরা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখবার যো নেই, কিন্তু ওদেরই মধ্যে একজন গৌরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের দৌলতে। গৌর একটু ঠাট্টার সুরেই বলল সঙ্গিনীদের—"ওটি কে গো? ঐ যে দারুণ লম্বা?"

যুবকটি কি গৌরের কথা শুনতে পেয়েছিল? সম্ভব নয়। তবু সে হঠাৎ সেই সময়ই ফিরে তাকাল। আর একবার মাত্র তাকিয়েই আপাদ-মস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ রকম দেখে নিল গৌরের। সেই একবারের নজরই যেন একটা সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা—"ওটি কে হে? পেইম্পলের মেয়েদের মত কানঢাকা টুপি পরে, অথচ অন্যদিকে এত সৌখিন? কে ও? কোনদিন ওকে দেখি নি কেন আগে?"

একবার তাকিয়েছিল, সেই তাকানোর ভিতর থেকেই ফুটে উঠেছিল মৌন কিন্তু প্রখর জিজ্ঞাসা। তারপরই তার সহজাত শালীনতাবোধ এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়া'ল সেই দর্শনসুখের, চোখ তার আপনা থেকেই নীচু হয়ে এল। গানবাজনার দিকেই অখণ্ড মনোযোগ দেখা গেল তার। ওদিক থেকে মেয়েরা তার মাথার চুল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না আর। সে-চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে কালো কালো কোঁকড়া গোছায়।

অন্যছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করতে একটুকুও দ্বিধা হয় নি গৌরের, কিন্তু এই বিশেষ ছেলেটির, এই অতিরিক্ত লম্বা সুকেশ যুবকটির বেলায় সে আর নাম জিজ্ঞাসার দিক দিয়েও গেল না। গলা দিয়ে স্বরই ফুটল না

যেন। ওর মুখের পাশটাই এক পলকের তরে দেখেছিল সে। ওর চোখের সেই গর্বী অথচ লাজুক দৃষ্টি, নীল্‌চে নয়নে বাদামী তারার ক্ষণিকের নাচন —বিজলীর ঝিলিক দিয়ে গিয়েছে গৌরের মনে, ওর কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

'গেয়স-ছেলেটা' নামে মোয়াঁ-ঠাকুরমা যাকে অভিহিত করেছেন তাঁর পত্রে, তারই সঙ্গে এইভাবে গত শীতে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল গৌরের। দেখার আগে অবশ্য প্রায়ই ওর কথা কানে আসত, মোয়াঁদের বাড়িতে। কারণ মোয়াঁ পরিবারের একমাত্র ছেলে যে সিলভেস্টার, তার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি ঐ ইয়ান। আর সিলভেস্টার ত গৌরের শৈশবসহচর, সহোদর ভাইয়েরই মত, দূর সম্পর্কের ভাইও বটে।

৩

গৌর আর ইয়ানের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে একটা বিবাহ-উৎসবে। গৃহকর্ত্রী গৌরের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন ঐ গেয়স ছোকরাকেই। মিছিলে পাশাপাশি হাঁটা, ভোজের টেবিলে নিয়ে যাওয়া, নাচের মজলিসে সুখ-সুবিধার তদ্বির করা, এ-সবের জন্য প্রত্যেক তরুণীর সঙ্গে একটি জুৎসই তরুণকে জুড়ে দেওয়া—গৃহস্বামিনীর বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে এটিও অগ্রগণ্য একটি।

বিবাহ-বাসরে গৌর যখন উপনীত হ'ল, তখন বেশভূষা প্রসাধনে সবাইয়েরই দৃষ্টি সে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করেছে। গৌর মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে এ সাজসজ্জাকে সে সার্থক বলে বিবেচনা করতে পারবে, শুধু যদি অন্য সবাইয়ের মত সেই গেয়স ছেলেটাও আকৃষ্ট হয় এর দ্বারা। আগের বারের এক পলকের চোখোচোখি যে মনে দাগ কেটে ব'সে গিয়েছে গৌরের।

কিন্তু আকৃষ্ট হওয়া ত পরের কথা, ইয়ানের মোটে দেখাই নেই। সবাই এসে পড়েছে, একমাত্র ইয়ান ছাড়া। বেশী দেরী তার জন্য করা তো সম্ভব নয়! মিছিল বেরুবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। বেরুবে, কয়েকটা রাজপথ ধীর মন্থর গতিতে পরিক্রমা করবে, ফিরে এসে তবে বসবে ভোজের

টেবিলে। বেরুতে দেরী হ'লে খেতেও দেরী হবে। সব-চেয়ে মারাত্মক কথা, নাচের সময় আপনা থেকেই সংক্ষেপ হ'য়ে যাবে।

গৃহকর্তার ভাবটা এই যে ইয়ানের জন্যে আর দেরী করা সম্ভব নয়। ইয়ানের অনুপস্থিতিতে গৌরের সহচর হিসাবে কাকে নির্দেশ করা যায়,' এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ শুরু ক'রে দিয়েছেন তিনি। গৌরের মনটা তিক্ত হ'য়ে গেল। তার এ বেশভূষা যে ইয়ানেরই জন্য, তা এতক্ষণে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করল। অন্য কারও সঙ্গিনী হবার জন্য সে এমন মোহিনী বেশ ধারণ করে নি, করে নি। যা হোক, শেষ রক্ষা হ'ল কোনরকমে। গৌর যখন নৈরাশ্যে ভেঙ্গে-পড়ার মতই হয়েছে প্রায়, শ্রীমান ইয়ান তখন হন্তদন্ত হয়ে দেখা দিলেন এসে। উৎসবের বেশই অবশ্য প'রে এসেছে, কিন্তু মুখে তেমন প্রসন্নতার আভাস নেই। "কেন এমন দেরী?"— গৃহকর্তার এই সঙ্গত প্রশ্নের জবাবে যে-কথা সে বলল, তাও জবাব হিসাবে শতকরা একশোভাগ সঙ্গত। অন্তত ধীবর সমাজের বিবেচনায়।

সে জবাব এই। বিকালের দিকে ইংল্যাণ্ড থেকে সংকেত পাওয়া গিয়েছিল যে বিশাল একটা মাছের ঝাঁক সেখান থেকে ব্রিটানির সমুদ্রের দিকে চ'লে আসছে। যে-বেগে তা আসছে, তাতে সন্ধ্যার মধ্যেই অরিনি অন্তরীপের পাশ দিয়ে তার দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। সংকেত পৌঁছানো মাত্র প্লাউবাজলানেকবাসী জেলেরা নৌকা নামিয়ে ফেলেছিল জলে। শীতের দিনের কয়েক মাস আইসল্যাণ্ডিয়ারা বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু বেকার থাকে না। স্থানীয় সমুদ্রে মাছ ধরে গাঁয়ের জেলেদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। ইয়ানও অবশ্যই একজনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছে। হঠাৎ সেই মালিক ইয়ানকে ডেকে পাঠা'ল যখন, কাজে নামবার জন্য, ইয়ান পড়ল ফাঁপরে। মাছ ধরতে যায়, না নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যায়? মালিকের হুকুম অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। নিজে না গেলে অন্ততঃ একটা লোক বদলা-হিসাবে দিতে হবেই। অনেক কষ্টে একজন যোগ্য বদলা যোগাড় ক'রে দিয়ে তবে ইয়ান ছুটি পেয়েছে নেমন্তন্নে আসার জন্য।

এ-কৈফিয়ৎ সর্বাংশে সন্তোষজনক। কাজেই ও কথা নিয়ে আর আলোচনাই হ'ল না। যদিও পেইম্পলের জেলেরা গজগজ করতে থাকল এই নালিশ নিয়ে যে প্লাউবাজলানেকবাসীরা অত্যন্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে মাছের ঝাঁকের আগমন সংবাদটা পেইম্পলে না পৌঁছে দিয়ে।

আজকার এই অপ্রত্যাশিত লাভটা একা একা তারাই ঘরে তুলবে, এটা অন্যায়।

যা হোক, মনের দুঃখ মনেই চেপে যুবকেরা মিছিলে নেমে পড়ল, যে যার সঙ্গিনীর হাত ধ'রে। বাইরে বেহালা বেজে উঠেছে। মিছিল উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে নারীকণ্ঠের কলকাকলীতে।

ইয়ানের আচরণে প্রথম দিকটাতে খুবই আড়ষ্টভাব দেখা গেল। মামুলি মিষ্টি কথা, যা যে-কোন যুবক যে কোন সঙ্গিনীকে বলতে পারে এ রকম উপলক্ষে। সঙ্গিনীটি একদম অপরিচিতা হলেও। আর গৌর ত বলতে গেলে ইয়ানের কাছে প্রায় অপরিচিতাই! এই যে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীরা মিছিলে বেরিয়েছে আজ, এদের মধ্যে ইয়ান আর গৌরের জুড়িটাই শুধু অপরিচয়ের অসুবিধার সম্মুখীন। বাকী সবাই পরস্পারের সুপরিচিত বন্ধু ও বান্ধবী, অনেক ক্ষেত্রেই দূর সম্পর্কের ভাই-বোনও। অবশ্য দূর সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রণয় ও পরিণয়ের অন্তরায় হয় না এদেশে। ব'লতে গেলে এই যে জোড়াগুলো হাতধরাধরি ক'রে চলেছে আজকার মিছিলে, অদূর ভবিষ্যতে এরা সবাই এক এক জোড়া দম্পতীতে পরিণত হবে।

যা হোক মামুলি আলাপনেই মিছিলের সময়টা কেটে গেল। ফিরে এসে নাচের শুরু। কী নিয়ে আলাপ শুরু হবে এবার? আবার সেই মাছের ঝাঁকের কথা নিয়ে নাকি? হ্যাঁ, পরোক্ষভাবে তাই বটে। মাছকে বাদ দিয়ে জেলের জীবনে কোন্ কাজটাই বা হ'তে পারে?

তবে মাছ ধরার কোন কথা এবার নয়। ইয়ান হঠাৎ ব'লে বসল গৌরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে—"পেইম্পলে তুমিই একমাত্র একজন, মামোয়াজেল গৌর, শুধু পেইম্পলই বা বলি কেন, সারা পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আছ, যার জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব ছিল আমার পক্ষে। পয়সার লোভ বড় লোভ নয়, সমুদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের লোভ জয় করা আইসল্যাণ্ডিয়াদের পক্ষে কঠিন।"

গৌর প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। এই ধীবর তার সঙ্গে এমন ভাষায় কথা কইতে সত্যিই সাহস করল? কিন্তু সে বিস্ময় পরের মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে গেল আনন্দে আর উত্তেজনায়। সে মিষ্টি স্বরে উত্তর

দিল—"ধন্যবাদ, মসিয়ঁার ইয়ান! আমিও—মানে, অন্য কারও সঙ্গিনী হওয়ার চাইতে আপনার সঙ্গই আমি পছন্দ করি।"

নাচ চলল সারা রাত্রি। পরিচিতেরা সবাই যোগ দিয়েছে নৃত্যে। প্রশস্ত কক্ষে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে তারা। ইয়ান বেশীর ভাগ নাচই নেচে চলেছে গৌরের সঙ্গে। গৌর'ও অন্য দুই একজন যুবকের সঙ্গে দুই একটা নাচ না নেচে পারবে কেন? কিন্তু মোটের উপর সে যেন ইয়ানেরই চিহ্নিতা নৃত্যসঙ্গিনী হয়ে রইল সারা রাত।

প্রায় ভোরবেলায় শেষ হ'ল সে-নৃত্যোৎসব। এবার বিদায় নেবার পালা। যে-সুরে বিদায়-সম্ভাষণ জানা'ল ইয়ান, তা অন্তরঙ্গ হৃদয়াবেগেরই সুর। গৌর এই বিশ্বাস নিয়েই ঘরে ফিরল যে ইয়ানকে সে জয় করেছে।

আর সে? সে ত বিজিতা হয়েছে পার্কে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনই। কিন্তু কথায় বলে যে প্রণয়ের পথ মসৃণ নয়। কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, হাড়ে হাড়ে টের পেতে হ'ল বেচারী গৌরকে।

নাচের উৎসবটা হয়েছিল জানুয়ারিতে। তখনও বসন্ত ঋতু তিন মাস দূরে। আইসল্যাণ্ডিয়ারা সমুদ্র যাত্রা করবে আরও তিন মাস পরে। এপ্রিলের গোড়ায়। গৌর খুবই নিশ্চিন্ত ছিল—এই দীর্ঘ তিন মাস কালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে ইয়ান। অন্য দম্পতীর পরিণয় বাসরে যে নতুন সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছে ইয়ান আর গৌরের ভিতরে, তা সুসঙ্গত পরিণতি লাভ করবে এই সময়টার মধ্যে। ওদেরও পরিণয়টা সমাধা হয়ে যেতে পারবে, এপ্রিলের আগেই, এ-প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই করতে পারে সে। কারণ ব্রিটানি প্রদেশের এই বিশেষ অঞ্চলটাতে, এই বিশেষ সমাজটার ভিতরে পূর্বরাগের পর্বকে অহেতুক দীর্ঘায়িত করার রীতি নেই।

কেন থাকবে? মানুষের জীবন যে পদ্মপত্রে জল ছাড়া আর কিছু নয়, একথা আইসল্যাণ্ডিয়ারা যেমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবার উপলক্ষ পেয়ে থাকে অনুক্ষণ, এমন আর অন্য কারা পেয়েছে কবে? পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে? প্রতি বৎসরই ঘটছে সে উপলক্ষ। পেইম্পল বন্দর থেকে মাছ ধরতে যারা যায় আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে, কোন বৎসরই তারা শতকরা একশোজন নিরাপদে ঘরে ফেরে না। একশোর মধ্যে নব্বইজন যদি ফিরল, লোকে জানল—সমুদ্রদেবী মা মেরী খুবই দয়া করেছেন এবারে।

না। নিশ্চয়তা নেই কারও বেলায়, বসন্তের সোনালি দিনে যারা ডিঙ্গা সাজিয়ে বীরবেশে সমুদ্রে ভাসল, হেমন্তের আসন্ন কুহেলির আগে আগে তারা যে কে আসবে, কে আসবে না, কেউ আগে থাকতে বুঝতে পারে না। একটা গোটা বোটই হয়ত হারিয়ে যেতে পারে এক ঝড়ের রাতে। পাঁচ বা ছয়টা জীবন অকাল সমাধি লাভ করল তাহলে মেরু সমুদ্রের হিমেল জলে। বোটডুবির মত বৃহৎ দুর্ঘটনা না ঘ'টলেও ছোট-খাটো বিপদ ত হামেশাই ঘ'টতে পারে। বড় একটা ঢেউ হয়ত নৌকার ছাদ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে কোন অসতর্ক ধীবরকে। বোটের গা বেয়ে সামুদ্রিক সর্প উঠে এসে দংশন করেছে কোন অভাগা নাবিককে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর ওসব বিষধরের কামড়ও মারাত্মক।

না। ধীবরের জীবন আজ আছে, কাল নেই। কাজেই বিবাহের ব্যাপারটা তারা তড়িঘড়ি চুকিয়ে ফেলারই পক্ষপাতী। "হেসে নাও, দুদিন বই ত নয়, কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়," এই হল তাদের জীবন-দর্শন।

অথচ এই সমাজে মানুষ হয়েই ইয়ান এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার করছে কেন? নাচের মজলিসে যে-প্রত্যাশা সে জাগিয়ে এল একদিকে গৌরের মনে, অন্যদিকে পরিচিত বন্ধুমহলে, তা পরিণতির অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে তার ত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না? এরকম ক্ষেত্রে দুই এক দিনের মধ্যেই যুবকটির উচিত প্রার্থিতার বাড়িতে দেখা দেওয়া, তার বাপ-মা-অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা। এবং আরও দুই একদিন পরে—

কিন্তু ইয়ান ত দোরগোড়াও মাড়ায় না গৌরের বাড়ির! বরং—

একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। রাস্তা অবশ্য ঠিক সেটা নয়, সরু একটা গলিপথ গৌরের বাড়ির অদূরে। গলির দু'ই ধারেই বাড়ি আছে, কিন্তু সব বাড়িরই পিছন ফেরানো এ-গলির দিকে! লোকজন খুব কমই চলে এ পথে। কারণ এর ও-মাথায় একটা অনাবাদী মাঠ। হারানো গরু-ভেড়ার খোঁজ করার প্রয়োজনে ছাড়া কেউ সেখানে যায় না।

এই জনহীন পথে গৌর সেদিন কেন গিয়েছিল বেড়াতে, তা সেই জানে। আর ইয়ানও যে কেন সেই সংক্ষেপ পথটাই বেছে নিয়েছিল

মাঠের ওপারে কোন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্য, বোধ হয় ইয়ান নিজেও জানে না। সম্ভবতঃ, এটা প্রজাপতির নির্বন্ধ।

কিন্তু তাই যদি হয়, সে নির্বন্ধ ফলপ্রসূ হ'ল না এ যাত্রা। হঠাৎ গৌরকে দেখে ইয়ান যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল একদম। টুপিটা হাতে নিয়ে দু'হাতে তাকে মোচড়াতে থাকল ক্রমাগত, একধারের বেড়ায় ঠেসান দিয়ে। আর গৌর? সে প্যারি-ফেরতা মেয়ে, সে হতবুদ্ধি হওয়ার পাত্রী নয়। সেই এগিয়ে এসে ব'লল—"সুপ্রভাত, মসিয়ঁার ইয়ান, কেমন আছেন?"

ইয়ানকে অগত্যা বলতেই হ'ল—"সুপ্রভাত, মাদোজেল মার্গারেট, আপনি কেমন আছেন?"

এর পর ইয়ান নির্বাক! এবং এর পরে প্যারি-ফেরতা গৌরের পক্ষেও আর আলাপচারি চালাবার উপায় রইল না। দু'জনে দু'দিকে চ'লে গেল, যেন জানুয়ারির সেই নাচের সন্ধ্যার অন্তরঙ্গতাটা গৌরের জীবনে এক নিদাঘ নিশীথের অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

গৌর কিন্তু হতাশায় হাল ছেড়ে দিল না। ব্যাপারখানা যে কী, তা সে বুঝতে পারছে না অবশ্য। আর পেইম্পল-সমাজে তার এমন মরমিয়া সখীও কেউ নেই, যার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এ রহস্যের একটা সমাধান করার জন্য সে যত্নবতী হ'তে পারে। সে নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল —"ব্যাপারখানা কী?" হয়ত মানুষটা লাজুক, ঐ ইয়ান। হোক না চেহারা দৈত্যের মত! এমন গল্প অনেক শোনা আছে গৌরের, যাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হ'ল এই যে বাহ্যতঃ কাঠখোট্টা মানুষেরাই নারীঘটিত ব্যাপারে ভীতু আর দ্বিধাগ্রস্ত হয় বেশী।- ইয়ানও হয়ত সেই শ্রেণীর।

কিম্বা এমনও হতে পারে যে লাজলজ্জা নয়, গর্বই হচ্ছে ইয়ানের দিকের অন্তরায়। গর্ব দারিদ্র্যের। সেদিন নাচের মজলিসে অনেক কথাই ইয়ান ব'লে ফেলেছিল গৌরকে। কিছুদিন আগেও তাদের সাংসারিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ। ভাইবোনে চৌদ্দ জন তারা। এমন দিন অনেক গিয়েছে, যখন পেট ভ'রে খেতে পায়নি তারা। তারপর তার বাবা ইংলিশ প্রণালীতে একটা বেওয়ারিশ বোট পেয়ে যায়, সেটা বিক্রি হয় দশ হাজার ফ্রাঁ দামে। সেই থেকেই অবস্থা ফিরেছে

একটু। বাড়িটার দোতলায় একখানা বড়ঘর করেছে, দেশের ভিতর এখন দশজনের একজন তারা।

হ্যাঁ, সরলভাবেই এসব কথা গৌরকে সেদিন বলেছিল ইয়ান। গৌরের সঙ্গে নিজের আর্থিক সঙ্গতির তুলনা করার কোন কল্পনা নিশ্চয়ই তার ছিল না। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে বর-ক'নের পারিবারিক সচ্ছলতার কথা ত উঠবেই! আর ইয়ান-গৌরকে নিয়ে যদি সে-রকম কথা ওঠে কখনো, ইয়ান নির্ঘাৎ লজ্জা পাবে। দয়া?

মিভেল অবশ্য অর্থের পরোয়া না ক'রতে পারেন, একমাত্র সন্তান তাঁর ঐ গৌর। তাঁর সব কিছুরই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কাজেই ইয়ানের দৈন্যদশার দরুণ তাঁর মেয়ের কোন অসুবিধা ঘটবার কোন আশঙ্কা মিভেল দেখতে পাবেন না। তিনি মেয়ের উপর স্নেহবশতঃই গরিব ইয়ানের করে সম্প্রদান করবেন তাকে।

কিন্তু মিভেলের পক্ষে যেটা হবে স্নেহের ব্যাপার, ইয়ান সেটাকে নেবে দয়ার ব্যাপার ব'লে। সে-হীনতা স্বীকার করা কি ইয়ানের মত গর্বী যুবার পক্ষে সম্ভব? হয়ত না। আর তা নয় বলেই সে পিছু হটেছে। নাচের সময় একটা উন্মাদনা এসেছিল। তারই দরুণ মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু মজলিস থেকে বেরিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল যখন, নেশার ঘোর কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এইটাই সম্ভব। বিবাহের প্রস্তাব আনতে সাহস পাচ্ছে না ইয়ান। ভাবছে, যেচে হীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া হবে তাতে। দয়া ক'রে মিভেল তাকে কন্যাদান করবেন, এ-চিন্তা তার পক্ষে অসহ্য। তার মত মানুষের পক্ষে কারও কাছে দয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের মধ্যে পুরুষ-সিংহ সে।

এ-সংকট থেকে তাহলে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি?

উপায়ও একটা মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে ব'ার করল গৌর! সে ইয়ানের বাড়িতে গিয়েই ইয়ানকে পাকড়াবে। রাস্তাঘাটে কথা বলে কার্যসিদ্ধি হবে না, ভাল ক'রে গুছিয়ে কথা বলার সময়ই দেবে না ইয়ান। কিন্তু বাড়িতে গেলে? সেখানে ত আর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারবে না ও! শুনতেই হবে গৌরের কথা। গৌর তাকে বুঝিয়ে দেবে যে বিবাহটা করলে ইয়ানের পক্ষে সেটা দয়া গ্রহণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না। বরং

উল্‌টোটাই হবে। মিভেলের কথা তোলার দরকার নেই। মুখ্যতঃ যে এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, সেই গৌর মনে করবে যে দয়াটা তাকেই করা হয়েছে।

হ্যাঁ, যাবে সে ইয়ানের বাড়িতে। অনেক দূর। প্লাউবাজলানেক ছাড়িয়ে পোর্স ইভেন গ্রামে। একেবারে ওদিককার সমুদ্রের কূলে। পথও তেমন ভাল নয় সব জায়গায়। কোন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে, কোন জায়গায় চড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে। তা ব'লে আর করা যাবে কী? পারতেই হবে গৌরকে। ইয়ানকে বাগ মানাতে হ'লে এ কাজ পারতেই হবে তা'কে।

মনের কথা বলবার মত সখী গৌরের নেই। থাকত যদি, আর গৌর তাকে বলত এসব কথা, সে নিশ্চয়ই অবাক হ'ত। নাক সিটকে সে নিশ্চয় বলত—"ইয়ান ছাড়া আর কি ছেলে নেই পেইম্পলে? একটু লম্বাচওড়া বেশী ব'লেই সে এমন কী সাত রাজার ধন এক মাণিক হয়ে উঠল? ভুলে যাও ওকে!"

এমন পরামর্শ গৌরকে দেবার লোক নেই ওদেশে। থাকত যদি, আর সে দিত ঐ পরামর্শ, গৌর তাকে অবশ্যই বলত—"থাকবে না কেন অন্য ছেলে? অঢেল আছে, তবে তারা তোমাদের জন্য। আমার জন্য আছে ঐ একটিই। "বীর সমঝে বীরবালা।" ও-ছাড়া আমার মন উঠবে না অন্য কাউকে নিয়ে।"

সুতরাং গৌর বাবার কাছে চলল অনুমতি নেবার জন্য। নেবার অছিলা একটা ঠাউরেছে। সে জানে গেওস-কর্তার সঙ্গে তার বাবার বৈষয়িক লেনদেন কিছু ছিল। সেই যখন সমুদ্রে সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়াত গেওস, আর মাছের আড়তদারি করত মিভেল গ্যাস্কনি উপসাগরের বন্দরে বন্দরে, তখনকারই লেনদেন। সে-বাবদ গেওসের এখনও কিছু পাওনা আছে মিভেলের কাছে।

গৌর গিয়ে বাবাকে বলল—"গেওসদের সেই দেনাটা না মেটালে আর ভাল দেখাচ্ছে না বাবা! কথা উঠছে ও-নিয়ে পেইম্পলে। তুমি ওটা দিয়ে দাও।"

মিভেল মাথা নাড়লেন—"দিয়ে দিতে হবে বই কি! কিন্তু কাকে দিয়ে পাঠাব? গেওস ত আসছে না!"

গৌর প্রস্তাব করল—"আমিই গিয়ে দিয়ে আসি, তোমার যদি না আপত্তি হয়। সেটা ভালই হবে। বাড়ি ব'য়ে দেনা মিটিয়ে আসছি আমরা, এটা লোকে বেশ ভাল নজরেই দেখবে। অনেকে আমাদের অহঙ্কারী বলে, তাদের সে ধারণা যে কত বড় ভুল, তা বুঝবে তারা।"

মিভেল অনেক পোড়-খাওয়া বিচক্ষণ লোক। ইয়ান গেওস সম্পর্কে মেয়ের দুর্বলতার ব্যাপারটা তিনি সম্ভবতঃ আঁচ ক'রে থাকবেন খানিকটা। দেনা শোধের ব্যপদেশে পোর্স-ইভেন পর্য্যন্ত হেটে যাওয়ার সঙ্গে সে-দুর্বলতার যে পরোক্ষ কোন যোগ থাকতেও পারে, এটা তিনি অসম্ভব ভাবতে পারলেন না। আর অসম্ভব যদি না হয়, তা হ'লে পোর্স-ইভেন অভিযানের ভিতর গৌরের বাড়াবাড়ি কী আছে? গেলে যদি সুবিধা হয়, যা'ক সে। ইয়ানের চেয়ে ভাল জামাই যে এই জেলের মুলুকে মিলবে না, সে বিষয়ে খুবই সচেতন এই ভূতপূর্ব জলদস্যু।

"কত ফ্রাঁ ওদের পাওনা, তা ত চট্ ক'রে বলতে পারছি না"—বললেন তিনি— "এক শো ফ্রাঁ আপাততঃ বু'ড়ো গেওসকে নিয়ে দাও ত দেখি! তাতে যদি সে চূড়ান্ত রসিদ লিখে দেয় ত ভাল। আর তা যদি না দেয়, তখন খাতাপত্র খুলে দেখতে হবে আবার। ফাঁকি আমি দিই না কাউকে।"

না, একথা খুবই ঠিক যে মিভেল ফাঁকি কাউকে দেন নি। যা নেবার, তা কেড়েই নিয়েছেন, ঠকিয়ে নেওয়ার ধার ধারেন নি। হিংস্র হ'তে পারে তাঁর ব্যবহার, খল নয়।

অবশেষে সত্যিই একদিন পোর্স-ইভেনের পথে বেরিয়ে পড়ল গৌর। প্রাতরাশ সমাপন ক'রেই। পথ লম্বা, পথ সুগম নয়, বর্ষাবাদলের কাল না হ'লেও হঠাৎ এক পশলা নেমে না বসতে পারে, তা নয়। ফিরতেও হবে সন্ধ্যার আগেই। চোর বদমাইশ গুণ্ডা এদেশে নেই। মহিলারা সর্বত্রই নিরাপদ। রাত দুপুরে নির্জন গিরিসানুতেও। তবু সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে আসা দরকার, বাবাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য।

ঘণ্টা খানেকের উপর সে হাঁটছে। চারদিকে চোখ রেখে রেখে। মনে উত্তেজনা আছে যথেষ্ট। কিন্তু বাইরে সে শান্ত। সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে, কী আরামের হাওয়া! এ-হাওয়া মরার দেহেও নব জীবনের সঞ্চার করতে পারে বোধ হয়।

যেখানেই একটা তেমাথা বা চৌমাথা, সেখানেই সুবৃহৎ দারুময় মূর্তি একটি। প্রভু যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। ব্রিটানি অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি। পথ চলবার সময় প্রত্যেক পথিকই এখানে এসে বুকের উপর আঙ্গুল দিয়ে ক্রুশ আঁকে। যারা ভক্ত মানুষ, তারা আবার হাঁটু গেড়ে ব'সে দারুমূর্তির পদচুম্বনও করে।

এই রকমই এক দারুমূর্তির পায়ের কাছ থেকে দু'টো রাস্তা দুইদিকে বেরিয়ে গিয়েছে। কোন্ পথে যাবে গৌর? ছোট্ট একটি মেয়ে ঠিক সেই সময় এসে পড়ল সেখানে—"সুপ্রভাত মামোয়াজেল গৌর!"

আরে, এ যে চেনা লোক! নাচের মজলিসে সে-রাত্রে ইয়ান চিনিয়ে দিয়েছেন—"ঐ আমার এক বোন সুজান—"

গৌর তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, তারপর জিজ্ঞাসা করল তার মা বাবা বাড়িতে আছেন কিনা। "বাবা, মা? আছেন—" বলল সে—"বাড়িতে সবাই আছে, বড়দাদা ইয়ান ছাড়া"—মেয়েটি যে ইচ্ছে ক'রে একথা বলেছে গৌরকে খোঁচা দেওয়ার জন্য, তা কিন্তু মোটেই নয়। সত্য কথা সরল ভাবেই জানিয়েছে—"বড়দা গিয়েছে লোগুইবি। এসে পড়বে এক্ষুণি হয়ত।"

দেখ বিড়ম্বনা! ভাগ্য সত্যিই বিরূপ গৌরের উপরে। যাকে দরকার, সে ছাড়া অন্য সবাই আছে বাড়িতে। সব ক্ষেত্রেই বাধা, অপ্রত্যাশিত অন্তরায় কোথা থেকে যে দু'জনের মাঝে গজিয়ে ওঠে, গৌর ভেবে পায় না। একবার দারুণ ঝোঁক হ'ল—এইখান থেকেই সে ফিরে যাবে। কিন্তু তাহলে গেওসেরা ভাববে কী? এই ছোট্ট খুকিটা ত এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে বলবে যে মামোয়াজেল গৌর আসতে আসতে ফিরে গেল, বড়দা বাড়িতে নেই শুনে। কী লজ্জার কথাই না হবে সেটা!

না, পোর্স-ইভেন পর্যন্ত যেতেই হবে। হয়ত ইতিমধ্যে এসেও পড়তে পারে ইয়ান। তাকে সময় দেবার জন্যই খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল গৌর।

ইয়ানের গাঁ যত নিকট হচ্ছে, প্রকৃতি তত হ'চ্ছে বুনো আর রুক্ষ। সামুদ্রিক ঝড় মানুষকে করে শক্তিমান, কিন্তু উদ্ভিদকে করে নিস্তেজ। ঊষর মাটিতে তারা চ্যাপটা লেগে যেতে চায়। বেঁটে খাটো শ্রীহীন হয়ে যায় তারা। যে সরু রাস্তা দিয়ে তারা চলেছে তা একধরনের সামুদ্রিক

আগাছায় আচ্ছন্ন। কেমন বিটকেল ভিন্‌দেশী চেহারা তাদের, তারা যেন এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে অন্য এক জগতের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে গৌর একটা নোনা গন্ধ সেই সব আগাছা থেকে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে বাতাসে।

দুই একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে গৌরের। ন্যাড়া ন্যাড়া তরুলতা-হীন আবেষ্টন, বহুদূর থেকেই মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। শুধু স্পষ্টভাবেই যে টের পাওয়া যায় তা নয়, মানুষকে সমুদ্রের পশ্চাৎপটে দেখায় অনেক বড় আকারের। এদেশের লোক, সে মাঝি হোক আর জেলে হোক, সর্বদাই দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। সমুদ্র যেখানে সমুখে নেই, সেখানেও সমুদ্রদর্শনের দৃষ্টি তাদের চোখে। গৌরকে দেখে তারা শুভযাত্রা কামনা করল। লোকগুলিকে ভাল লাগল গৌরের। রোদে-হাওয়ায় ঝলসানো সব মুখ। নাবিকের টুপির নীচে সে-সব মুখকে ভয়ানক পৌরুষমণ্ডিত আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হ'ল গৌরের।

তবু বেশী সময় ত কাটছে না। কী করলে আরও দেরীতে পৌঁছোনো যায় গেওসদের বাড়িতে? এত ধীরে সে হাঁটছে, অন্য পথিকেরা অবাক্ হচ্ছে তা দেখে।

লোগুইবিতে কী করতে গিয়েছে ইয়ান? সুজানকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে গৌরের, সে ভাববে কী? কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলতে পারলে সে শান্তি পেতো খানিকটা। কোন নারীর সাক্ষাৎলোভে ইয়ান যায় নি, গিয়েছে হয়ত চিংড়ি-ধরা চুপড়ি কিনতে। শীতকালে ত চিংড়ি-ধরাই মস্ত কাজ জেলেদের।

দূর থেকেই পাহাড়ের উপরে একটি উপাসনা মন্দির দেখা যাচ্ছিল। একদম ছাই-রং ঘরখানার। একান্ত ছোট, নিতান্ত প্রাচীন। ঊষর পরিবেশে এক ঝাড় বেঁটে গাছ এক জায়গায়, গাছগুলোর রংও ছাইয়ের মতই দাঁড়িয়েছে। একটি পাতা নেই কোন গাছে। সব গাছই একদিকে হেলে আছে, ঝোড়ো হাওয়ার তাড়নে। কোন মেয়ে যেন হাত দিয়ে মাথার সব চুল একপাশে ঠেলে দিয়েছে।

আর প্রকৃতি-মেয়ের এই হাতই সেই হাত যার দোলানিতে ধীবরের বোট সাগরগর্ভে ডুবে যায়। পশ্চিমা ঝড়ের আকারে এই হাতই ডাঙ্গার মোচড়ানো বৃক্ষশাখাকে ঢেউয়ের সম্মুখে হেলিয়ে দেয়। এই হাতেরই

"সুপ্রভাত, মসিয়ার ইয়ান, কেমন আছেন?" [পৃঃ ২৭

সুপ্রাচীন পেষণে গাছগুলো অঙ্কুরিত হবার পর থেকেই বাঁকানো তোবড়ানো ছন্নছাড়া বদচেহারা হয়ে পড়ে।

গৌরের পথ শেষ হয়ে এসেছে। এই উপাসনা মন্দিরটা পোর্স-ইভেন গাঁয়েরই নিজস্ব। এইবার একেবারে থেমে পড়ল সে, যাতে আর একটু সময় পাওয়া যায়।

নীচু একটা দেওয়াল, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে এক এক জায়গায়। সেই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ বিস্তীর্ণ খানিকটা জায়গা, অসংখ্য ক্রশকাঠ মাথা জাগিয়ে আছে সেই স্থানটাতে। একই পাঁশুটে রং সব-কিছুর—মন্দিরটার, গাছগুলোর, সমাধিস্তম্ভগুলিরও। ঝড়ের তাণ্ডবের চিহ্ন, সর্বত্র। একই পাঁশুটে রংয়ের শ্যাওলা পাথরে পাথরে, গিঁটওয়ালা গাছের ডালে ডালে, উপাসনা মন্দিরের চার দেয়ালের কুলুঙ্গিতে যে সব সাধুসন্তের মূর্তি রয়েছে, তাদের সারা অঙ্গ জুড়ে।

চারদিকেই ক্রশকাঠ মাথা উঁচিয়ে আছে। তারই একটাতে বড় বড় হরপে একটা নাম উৎকীর্ণ—"গেয়স, জোয়েল, আশী বৎসর।"

ওঃ, হ্যাঁ, সেই ঠাকুর্দা। গৌর শুনেছে। না, সমুদ্র তাকে গ্রাস করেনি, যদিও সমুদ্রে ডিঙ্গি বেয়ে বেয়েই জীবন কেটেছে তার। তা হ'লে ত ইয়ানের বহু পূর্বপুরুষই এখানে রয়েছেন অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত! একথা জানা উচিত ছিল গৌরের। আগে খেয়াল রাখলে হঠাৎ একটা চমক লাগত না ক্রশকাঠে এ-নামটা প'ড়ে।

এখানে এসেও এই সব স্বর্গীয় গেয়সদের আত্মার কল্যাণ-কামনায় একটা প্রার্থনা নিবেদন না করা অন্যায় হয় গৌরের পক্ষে, সে যখন এই গেয়স-পরিবারে স্থানলাভেরই আশা করছে। কাজেই সে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভিতর। খুব ছোট মন্দির, ক্ষ'য়ে-যাওয়া দেওয়ালে চুনকামের রং। নতজানু হয়ে বসতে যাবে গৌর, হঠাৎ সে থমকে দাঁড়া'ল। বুকের ভিতরটাতে মোচড় লাগল একটা। আবার গেয়স! আবার সেই একই নাম। দেয়ালে দেয়ালে চৌখুপি করা আছে পাথরের, তারই এক চৌখুপিতে স্মৃতিফলক একখানি। এরকম ফলক তাদেরই স্মৃতিরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়, যারা সমুদ্রে ডুবে মরেছে, সমাধি দেবার জন্য যাদের দেহ ডাঙ্গায় নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

এই রকম লেখা ফলকে—

"গেয়স, জাঁ-লুই,
বয়স চব্বিশ বৎসর। 'মার্গারেট' বোটের নাবিক।
১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট আইসল্যাণ্ডের কোন একস্থানে
অন্তর্হিত হয়েছিল। আত্মা তার সদ্গতি লাভ করুক।"
"গেয়স, ফ্রাসোঁয়ার
স্মৃতিরক্ষা কল্লে।'
এ্যান মেরি লি গোয়াস্টারের স্বামী,
'পেইম্পোলেই' বোটের কাপ্তেন,
১৮৭৭-এর ১লা থেকে ৩রা এপ্রিলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন
আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে তেইশজন নাবিকসহ।"

নীচে কোনাকুনি দু'খানা হাড় আঁকা, কাঁচির আকারে। তাদের উপরে কালো একটা মড়ার মাথা, তার চোখ সবুজ। বীভৎস এক ছবি, আদ্যিকালের শিল্পকলার পরিচায়ক।

গেয়স! গেয়স! সর্বত্রই গেয়সদেরই নাম। এই ইয়ানের নামও কোনদিন এখানেই উঠবে না ত নতুন এক স্মৃতিফলকে? যে-ইয়ান এখনও তার হয়নি, তার জন্য হৃদয়টা করুণায় পরিপ্লুত হয়ে এল গৌরের।

৪

ফিরে আসতে হয়েছে ব্যর্থ হয়ে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও ইয়ানের দেখা পায় নি গৌর। ইয়ানের বাবা, বুড়ো গেয়স, তিনি ত ভেবেই পান না যে গলদা-চিংড়ি-ধরা চুপড়ি কিনতে গিয়ে এত দেরী কেন হবে ইয়ানের।

অবশ্য মনে যাই থাকুক, গৌর কিছু আর মুখে কোন আকুলতা ব্যক্ত করতে পারে নি ইয়ানের জন্য। তবে কি বুড়োবুড়ী নিজেরাই কিছু অনুমান ক'রে নিয়েছেন? আটক কী? স্রেফ দেনাশোধের তাগিদে প্যারিতে-লালিতা ধনীর দুলালী পাহাড়ী পাকদণ্ডি বেয়ে বেয়ে এক-প্রহরের

রাস্তা হেঁটে এসেছে পোর্স-ইভেন পর্য্যন্ত, এটা বিশ্বাস করতে যদি না পেরে থাকেন ইয়ানের বাবা-মা, তাঁদের দোষ কে দেবে? তাদেরও ত যৌবন ছিল একদিন!

তাঁরা গৌরকে সাইডার খাওয়ালেন, দোতালায় নিয়ে নতুন ঘর দেখালেন, চৌদ্দটা ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের রূপগুণ বৈশিষ্ট্য বিশদ ব্যাখ্যা করে করে শোনালেন—

গল্পগুজবে সন্ধ্যা পার হয়ে যায় দেখে ইয়ানের মা বললেন—"তুমি ডিনার খেয়ে যাও আমাদের এখানে—"

না, না, সে কি হয় কখনো? এত দেরী করে ফেলেছে, ইয়ানের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে, মনে মনে লজ্জাই পেলো গৌর। একশো ফ্রাঁ গেয়সকে আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে আর দেরী করা কেন? এইবার বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল গৌর মনের দুঃখ মনেই চেপে। গেয়স নিজে তাকে এগিয়ে দিলেন প্লাউবাজলানেক পর্যন্ত। ইয়ান বাড়ী ফিরল যখন, তার বাবা মা দু'জনই শতমুখ গিভেল দুহিতার প্রশংসায়। এমন মেয়ে আর হয় না। প্লাউবাজলানেক পেইম্পেল ত নয়ই, সারা ব্রিটানিতে ওর জুড়ি মেলা ভার। পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে হ'ল ত কী হ'ল, দেমাক ব'লে কোন জিনিস ওর স্বভাবে নেই। আর কী পরিষ্কার চেহারা, কী চমৎকার কথাবার্ত্তা, রূপগুণ যেদিক দিয়েই বিচার কর, খুঁত নেই গৌরের ভিতরে।

শেষ পর্যন্ত ইয়ানের মা ব'লেই বসলেন—"এই মেয়েটিকে তুই বিয়ে কর ইয়ান!"

দু'চোখ বড় বড় ক'রে, খুব যেন একটা তাজ্জব কথা কানে এল—এমনি ভাবখানা দেখিয়ে ইয়ান ব'লল—"আ—মি? বল কী গো, আ—মি?"

"হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে? তোর সঙ্গে ওর মানাবে ভাল। তাছাড়া ওর বাবারও আপত্তি হবে না নিশ্চয়। আপত্তি যদি থাকত, অত-বড় মেয়েকে একা একা আসতে দেবে কেন আমাদের বাড়ীতে? আমার ত মনে হয়—তুই ইচ্ছে করলেই—"

ইয়ান যেন অগ্নিশর্মা একেবারে—"আমি তেমন ইচ্ছে করব কেন, শুনি? সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে কেন আমাকে? খাচ্ছি দাচ্ছি ফুর্তিতে আছি। সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরছি। ডাঙ্গায় এসে মাছ বিক্রির পয়সায়

আমীরি করছি। বিয়ে? আমি বিয়ে করব কোন্ দুঃখে, বল ত? তুমি আমায় যতখানি যত্ন করছ, বৌ এসে তার আদ্ধেক করতে পারবে, বলতে চাও? আমি ওসব ঝামেলায় নেই বাপু! বিয়ে-টিয়ে আমার পোষাবে না।"

যতই চ্যাঁচাক ইয়ান, কথাগুলো যে তার মনেরও কথা নয়, আর ব্যবহারিক হিসাবে কাজেরও কথা নয়, তা কি আর মায়ের বুঝতে বাকী আছে? তবে সেই মুহূর্তে তিনি আর ও-নিয়ে কথা বাড়ানো উচিত বিবেচনা করলেন না। যা ঘটবার, তা ঘটবেই। ভবিতব্যের উপরে অন্ধ বিশ্বাস রেখে আপাততঃ তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

এদিকে গৌর আর ভেবে পায় না যে দিন তার কেমন ক'রে কাটবে। বসন্ত ঐ দুয়ারে এল। আর মাস দেড়েক পরেই আইসলাণ্ডিয়ারা ডিঙ্গা সাজাবে সমুদ্র দিগ্বিজয়ের জন্য। তার আগে কি আর এই জটিল ব্যাপারটার কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভব? হ'তে পারত সম্ভব, একদিন নিরিবিলিতে ইয়ানকে কাছে পেলে। একটা বোঝাপড়া করা যেত হয়ত। এখনও গৌরের বিশ্বাস, তার আর ইয়ানের মধ্যেকার এই বোঝাপড়াটার পথে একমাত্র অন্তরায় হয়ে আছে—কী?

দু'টোর মধ্যে একটা জিনিস। হয় তার লাজুক স্বভাব, নয় তার দম্ভ। নিজে যেচে সে আসবে না করুণার প্রার্থী হয়ে। এগিয়ে যেতে হবে গৌরকেই।

এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ একদিন এল অবশ্য। রাত তখন প্রায় দশটা। ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছিল একটু আগেও, এই কতক্ষণ হ'ল তা গেছে। গৌর দোতলার ঘরে বসে আছে। একটু বাদেই শুয়ে পড়ার মতলব। ভিতরের দিকের জানালা খোলা। সেই জানালা দিয়ে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল হঠাৎ। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে কথা কইছে—

কে? ইয়ান কি? এও কি সম্ভব?

হ্যাঁ। অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটাই ঘ'টে গিয়েছে হঠাৎ। বুড়ো গেওস সেদিন একশো ফ্রাঁ নিয়েছিলেন গৌরের হাত থেকে, তার রসিদও দিয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত রসিদ দেন নি, ব'লে দিয়েছিলেন—তাঁর আরও কিছু পাওনা আছে মিভেল মশাইয়ের কাছে। তিনি নিজে একদিন এসে হিসাবটা পরিষ্কার করবেন।

নিজে তিনি আসেন নি। ছেলেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর দাবিদাওয়াটা বুঝিয়ে দিয়ে। ইয়ানের উচিত ছিল সন্ধ্যার মধ্যেই এসে মিভেলের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু পেইম্পলে ঢুকতেই এখানকার বন্ধুরা ছেঁকে ধরল তাকে। তাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আর সরাইখানায় আড্ডা দিতে দিতে সময় যে কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল, তা টেরও পেল না ইয়ান। তারপর নামল ঐ তুমুল বৃষ্টি, দেরি হয়ে গেল তাতেও।

এখন সেই বৃষ্টিটা থামতেই সে চ'লে এসেছে মিভেলের কাছে। বেশী কিছু কাজ ত নয়, গেওস তাঁর হিসাবটা লিখেই দিয়েছেন, সেইটা মিভেলকে দেওয়া। এবং মিভেলের জবাবটা শুনে যাওয়া। খুব সম্ভবতঃ মিভেল বলবেন—"আচ্ছা। আমার কাগজপত্রগুলো আমি আর একবার দেখি, তারপর জানাব।"

সুতরাং, দেরী যদিও হয়েছে, কাজটা মেটাবার সময় পাওয়া যাবে। বন্ধুদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে ইয়ান এসে মিভেলের সঙ্গে কথা কইছে। মিভেল অবশ্য তাকে ঘরে এসে বসতে বলেছিলেন। কিন্তু রাত বেশী হয়েছে, এবং বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—এই দুই দু'টো অজুহাত দেখিয়ে ইয়ান বসতে রাজী হয় নি। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েই কথা সেরে নিচ্ছে।

কী কথা তার হচ্ছে মিভেলের সঙ্গে, কানেই ঢুকল না গোরের। একটা চিন্তাই তার মনে এখন। ইয়ান এসেছে, এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সুযোগ, নিরিবিলি বোঝাপড়ার জন্য একটুখানি সময়, এসেছে তা এতদিন পরে। এসেছে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করা খুব সহজ নয়। সিঁড়ির নীচে শুধু ইয়ানই যে দাঁড়িয়ে আছে, তা নয়, আছেন গোরের বাবাও। বাবা যদি সৌজন্যবশতঃ ইয়ানকে একেবারে সদর দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যান, তাহলে ইয়ানকে নিরিবিলি পাওয়ার ত কোন উপায়ই হয় না! গোর ত আর তার বাবার সামনে গিয়ে বেহায়ার মত বলতে পারে না—"মসিয়ঁার ইয়ান, আমার একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে!"

কিন্তু এটুকু অন্ততঃ দয়া তাকে করলেন ভাগ্যদেবী, একটা উপায় অন্ততঃ হ'ল এই ব্যাপারে। মিভেল বললেন—"ইয়ান, তুমি এক মিনিটের জন্য ঘরের ভিতরে এস, আমার খাতাটা একবার তোমাকে দেখিয়ে দিই। তুমি গিয়ে তাহলে বলতে পারবে মসিয়ঁার গেয়সকে যে দু'-দিকের হিসাবে গরমিলটা হচ্ছে কোথায়—"

ইয়ানকে অগত্যা ঢুকতেই হ'ল ঘরে, আর সেই অবসরে, কোনমতে একটা মোটা আঙ্গরাখা গায়ে চাপা দিয়ে তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চ'লে গেল গৌর। গিয়ে একেবারে দাঁড়া'ল সদরের দরোজায়। হঠাৎ তার বাবা কোন কারণে ততদূর গিয়ে যদি তাকে দেখতে পেতেন সেই মুহূর্তে সেই অবস্থায়, নিশ্চয় খুবই অবাক হয়ে যেতেন তিনি।

কিন্তু ভাগ্যদেবীর দয়ার তহবিল নিঃশেষ হয় নি তখনো। মিভেল আর ঘর থেকে বেরুলেন না। একা ইয়ানই বেরিয়ে এসে সদরের দিকে এগুলো এবং দরোজায় অঙ্গরাখায় মুখ-ঢাকা একটি মূর্তিকে দেখে আঁৎকে উঠল একেবারে। পাহাড়ে সমুদ্রে যারা বরাবর মানুষ, কুসংস্কার তাদের মনে থাকেই একটু। ইয়ানের হঠাৎ সন্দেহ হ'ল—ভূত দেখছে সে। বুকের উপরে ক্রশ চিহ্ন এঁকে সে দুই পা পিছিয়ে এসেছে, এমন সময়ে কাঁপা কাঁপা একটু মিষ্টি স্বর কানে এল তার, "মসিয়ঁার ইয়ান, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম আপনাকে—"

এই বলেই মুখ থেকে আঙ্গরাখার আবরণ সে সরিয়ে নিল একটু। ইয়ান অমনি টুপি খুলে হাতে নিল, আর ভয়ানক বিস্ময়ের সুরে—

কে জানে সে-বিস্ময়ের কতখানি অকৃত্রিম, আর কতখানি ভান—

ভয়ানক বিস্ময়ের সুরে ইয়ান বলল—"আমার সঙ্গে? এমন কি কথা আপনার থাকতে পারে আমার সঙ্গে, যাতে এই ঝড়জলের রা'তে আপনাকে নীচে নেমে আসতে হ'ল—

"তা আপনি বুঝতে পারছেন না। নিশ্চয়ই না।"—বলল গৌর— "বুঝতে পারলে দুই মাসের ভিতর একবারও অন্ততঃ দেখা করতেন আমার সঙ্গে। যা'ক, আপনি যখন এতদিনেও তা বোঝেন নি, তখন আমি খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করি একটা কথা। জানুয়ারি মাসে একটা নাচের মজলিসে অনেকক্ষণ আমরা একসাথে কাটিয়েছিলাম। সেদিন আপনি একটা বিশেষ সুরে কথা বলেছিলেন. তা কি মনে আছে আপনার? যদি মনে থাকে, তা হ'লে আপনার এই পরবর্তী আচরণটি আমার সম্পর্কে, এ কি ঠিক সঙ্গত বা সুসমঞ্জস ব'লে বিবেচনা হয় আপনার?"

ইয়ান এক মুহূর্ত বুঝি কথার জবাব খুঁজে পেলো না। তারপর, একবার ঢোঁক গিলল। তারপরই তড়বড় ক'রে ব'লে যেতে লাগল—"ভুল! ভুল! আমি যদি সেই রাতে কোন বিশেষ সুরে কথা ব'লে থাকি, সেটা ভুল

করেছি। মজলিসের নেশা মনে ক'রে সেটাকে ক্ষমা করবেন। আপনার কথার ইঙ্গিত অবশ্য স্পষ্ট। কিন্তু ভেবে দেখুন—আমাদের মিলন একেবারেই অসম্ভব। আপনি ধনীর মেয়ে, একদিন এই বিষয়-আশয় সব আপনারই হবে। আর আপনি রাজধানীতে শিক্ষা পেয়েছেন, স্বভাবতঃই আপনার জীবনধারা আমার মত জেলে মানুষের সঙ্গে খাপ খাবে না কোনদিন। আপনার এই ঝোঁকটা সাময়িক, এ আপনি দু'দিনেই ভুলতে পারবেন। ভুললেই আমি খুসী হব। এখানে জোলো হাওয়া বইছে, আপনি উপরে যান। নইলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে আপনার। শুভরাত্রি!"

এই ব'লে গৌরের পাশ কাটিয়ে, প্রায় গৌরের সঙ্গে গায়ের ঘষা লাগিয়ে দ্রুতপদে ইয়ান রাস্তায় বেরিয়ে গেল। গৌরের নৈরাশ্য, গৌরের লজ্জা—এসবের পরিমাপ করবে কে?

কীভাবে যে গৌর উপরে উঠল, তা তার হুঁস ছিল না। উপরে উঠে সে সন্তর্পণে রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে ফেলল একটু। রাস্তায় এখনো জটলা করছে ইয়ানের ইয়ারেরা। লজ্জা দুঃখ সব ছাপিয়ে এখন গৌরের মনে যা প্রবল হয়ে উঠেছে, তা হ'ল ভয়। ইয়ান গিয়ে ঐ চোয়াড় ছেলেগুলোর কাছে গল্প করছে না ত যে মিভেলের মেয়ে যেচে এসেছিল তাকে অনুরাগ নিবেদনের জন্য? যে-রকম অবিবেচক নির্মম ও, তাও অসম্ভব নয় ইয়ানের পক্ষে।

কান পেতে শুনল রাস্তার ছেলেগুলোর আলাপ। না, ওরা বাদলা-বৃষ্টির কথাই আলোচনা করছে। এই আবহাওয়ায় সরাইখানায় ঢুকে আর এক প্রস্থ মাইফেল জমানো আদৌ অসঙ্গত হবে না, এই মতবাদই জোর গলায় জাহির করছে অনেকে। ইয়ান অবশ্য নির্বাক। গৌরের কথাই কি ভাবছে সে?

* * *

এসব পুরোনো কথা। মোয়াঁ ঠাকুরমা চিঠি শেষ করলেন গেয়সদের ছেলেটাকে আশীর্বাদ জানিয়ে। কথাটা চিঠিতে লিপিবদ্ধ করেই গৌর উঠে চ'লে গেল জানালার ধারে। জনবিরল পার্কের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উতলা মনকে ছুটিয়ে দিল স্মৃতিচারণের অভিযানে। ঐ পার্কেই প্রথম দেখা, ঐ অদূরবর্তী নিরিবিলি গলিটাতে দেখা দ্বিতীয়বার, দুইয়ের মাঝে রা'তভোর নাচের মহোৎসব পরস্পরের বাহুপাশে বিলীন হয়ে—

তারপর পোর্স-ইভেন পর্যন্ত ছুটে যাওয়া পলাতকের সন্ধানে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা, সর্বশেষে দারুণতর ব্যর্থতা বরণ ক'রে নেওয়া বাদল-ঝরা রাতে নিজের বাড়ীরই সিঁড়ির নীচে মুখোমুখি কথা বল্‌তে গিয়ে—

স্মৃতিচারণে মত্ত গোরের মন। কিন্তু ইয়ান তখন কোথায়? মাছ ধ'রে ধ'রে সমুদ্র চ'ষে বেড়াচ্ছে। জাহাজের নাম মেরী। কাপ্তেনের নাম মার্গিয়ার। ইয়ানের সহকর্মী সিলভেস্টার মোয়াঁ, এবং আরও তিনটি নাবিক—তারাও প্লাউবাজলানেক এলাকারই লোক।

সমুদ্র আজ খুবই শান্ত। আকাশ তার মুখ ঢেকেছে একটা ধূসর ঘোমটায়, চক্রবালের কাছাকাছি নেমে সে-ঘোমটার রং দাঁড়িয়েছে প্রায় কালো। নীচে নিস্তরঙ্গ জল থেকে বেরুচ্ছে একটা অস্পষ্ট আভা, তার দিকে তাকাতে গেলে চোখ আপনা থেকে বুজে আসে।

সন্ধ্যা? না, প্রভাত? বলা শক্ত, কারণ সূর্য একই জায়গায় অবিচল হয়ে রয়েছে, এই নিষ্প্রাণ জগতের দিকে তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সূর্যের চারিদিকে বিশাল জ্যোতির্মণ্ডল একটা, তারও আলো অনুজ্জ্বল, অস্থির, অনির্দেশ্য। জলের বুকে মেরীর ছায়া লম্বা দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক রকম। আকাশের ছায়াও আছে সে-জলে, তার রং ধূসর, সেই ধূসরের বুক জুড়ে রয়েছে সবুজ ছায়া মেরীর। আর যেখানে ছায়া পড়ে নি কোন-কিছুর, সেখানে দৃষ্টি চ'লে যায় জলের অতল তলে, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ দেখা যায় অপরিমেয় গভীরতায়। নিঃশব্দে তারা অভিযান ক'রে চলেছে একই দিকে, একই গতিবেগে; যেন কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য কোটি কোটি সংখ্যায় তারা বেরিয়ে পড়েছে সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যদলের মত। এরা সব কড মাছ। পাশাপাশি হাজার হাজার লাইন মাছের। সবগুলো লাইন জ্যামিতিক মাপে নিখুঁত সমান্তরাল। আর একই লাইনের ভিতর প্রতি দু'টো মাছের ভিতরকার ব্যবধানও সমান। হঠাৎ এক একবার মোড়ও ঘুরছে তারা। তখন প্রত্যেকটা মাছের লেজ দিচ্ছে একটা ঝটকা, প্রত্যেকটা মাছের রূপোর মত সাদা পেটের তলাটা দেখা যাচ্ছে এক মুহূর্তের জন্য। অক্ষৌহিণী-পরিমাণ ঝাঁকটার প্রান্ত থেকে প্রান্তে একই সঙ্গে জেগে উঠছে একটা মৃদু আলোড়ন।

সূর্য নেমে যাচ্ছে। দিগন্তের কোলে ঢ'লে পড়ছে ক্রমশঃ। দিগন্তলীন যে তিমিরবলয়, সীসের মত রং যার, তার আওতার ভিতর আসতেই

সূর্যের বর্ণ হয়ে গেল হলুদ। এইবার জ্যোতির্মণ্ডল থেকে এর অস্তিত্ব বেশ স্বতন্ত্রভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সূর্যবৃত্তের সীমারেখা এবার স্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

এখনো আলো দিচ্ছে কিছু, ঐ সূর্য। মনে হচ্ছে যেন ও আর বেশীদূরে নেই। মনে হ'চ্ছে যেন নৌকা নিয়ে অল্প দূর বেয়ে গেলেই এই বিবর্ণ বেলুনটাকে জলপৃষ্ঠের কয়েক ফুট মাত্র উপরেই বাতাসে ভাসমান দেখতে পাওয়া যাবে।

মাছ-ধরার কাজ চলছেই, তার বিরাম নেই। জল শান্ত, তার দিকে তাকালেই দেখা যায় কড মাছটা টোপ গিলতে আসছে পেটুকের মত, বঁড়শি বেঁধা-মাত্রই একটা ঝাঁকুনি দিচ্ছে, যেন কামড়টা শক্ত ক'রে বসাবার জন্যই। মিনিটে মিনিটে জেলেরা দুই হাতে সুতো গুটিয়ে তুলছে, তারপর মাছটা পিছনে উপবিষ্ট লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে, তার কাজ হ'ল ওটার পেট চিরে চ্যাপ্টা ক'রে ফেলা।

পেইম্পল-বন্দরের বোটগুলো পরস্পরের নজরের ভিতরেই রয়েছে। এখানে ওখানে ছোট ছোট পালগুলি দেখা যায়। অবশ্য পাল-খাটানো শুধু নিয়মরক্ষার ব্যাপার, কারণ বাতাস বিন্দুমাত্র নেই। ধূসর দিগন্তের পশ্চাৎপটে পালগুলোকে দেখাচ্ছে অতিমাত্র সাদা।

শান্তির পরিবেশ। আইসল্যাণ্ডিয়া ধীবরদের জীবনে যে বিপদ আপদ কিছু আছে, তা আজকের এ-মাছ ধরার দৃশ্য দেখলে কেউ বলবে না। এ-কাজ ত অতি সোজা, কোমলা মহিলারাও ত এ-কাজ করতে পারেন, ভাববে সবাই। মেরীর ছাদে মাছ ধরছে ইয়ান আর সিলভেস্টার। বালকের মত মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরেছে—"জাঁ-ফ্রাসোঁয়া-দ্য-ন্যান্তে, জাঁ-ফ্রাসোঁয়া, জাঁ-ফ্রাসোঁয়া-আ"—

ইয়ানের চেহারাও জমকালো, ভাবভঙ্গীও গম্ভীর। অন্য নাবিকদের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা করে না। ব্যতিক্রম কেবল ঐ সিলভেস্টার, গান করা বা খেলা করা, ওর সঙ্গেই সে করে। আজ জাঁ-ফ্রাসোঁয়ার গান নিয়েই সে মেতে উঠেছে সিলভেস্টারের সঙ্গে। গানটাও এমনি, ওর দুই কলির একঘেয়ে সুর যতই ভাঁজো, ক্লান্তি আসে না গাইয়ের কখনো।

৫

নীচে কেবিনের ভিতরে তখনও একটু আগুন রয়েছে লোহার চাড়িটার একেবারে তলায়। ছাদের দরোজা বন্ধ রাখা হয়েছে, যাতে কেবিনটা অন্ধকার থাকে, বাইরের অনির্বাণ আলো সত্ত্বেও। সেই অন্ধকারে তিনটে নাবিক অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাওয়া? শহুরে লোকেরা হাওয়া না পেলে আরাম পায় না ঘুমিয়ে। এরা কিন্তু তোয়াক্কা রাখে না ও-জিনিসের। ছাদে যখন থাকে, তখন ত বুক ভ'রেই সমুদ্রের তাজা হাওয়া গ্রাস করে রাক্ষসের মত। তাইতেই চ'লে যায় বিশ্রামকালটাও। বন্য পশুদের যা হয় আর কি! তারা ত সুড়ঙ্গের ভিতরই ঘুমোয়!

জাঁ ফ্রাসোঁয়া—

তিনটে নাবিক ঘুমোচ্ছে কেবিনে। বাকী তিনজন ছাদে রয়েছে বঁড়শি ফেলে। জাঁ ফ্রাসোঁয়ার তান মুখে লেগেই আছে, তবে একটু নীচু গলায়। গোলমাল হলে মাছ ভয় পেয়ে পালাতে পারে। বঁড়শি নামিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওরা দূর দিগন্তের দিকে তাকা'ল, কিছু একটা জিনিস কি নড়ছে ওখানে? নজরে আসে না বটে, তবু ওদের যেন মনে হয়—

ঠিক! ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে একটা, একেবারে জল থেকে। আকাশও ধূসর, কিন্তু এর ধূসরতা একটু বেশী গাঢ়। অন্য লোকের চোখে এর অস্তিত্ব মালুম হ'ত না, কিন্তু এরা সমুদ্রের অতল তল পর্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালনে অভ্যস্ত, এরা ঠিক ধরেছে—

ধোঁয়া? তার মানে স্টিমার—

কাপ্তেন বললেন—"আমার মনে হয়—রণপোত টহল দিচ্ছে—"

টহল দিক। দেওয়াই ওর কাজ। কিন্তু ওর ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী অনেক কিছু বার্তা বহন ক'রে আনছে প্রবাসী নাবিকদের কাছে। সে-বার্তা জন্মভূমি ফ্রান্সের, ব্রিটানির, প্লাউবাজলানেকের পাহাড়তলিতে লুকোনো কোন খড়ে-ছাওয়া পাথরের কুঁড়ের।

সে-বার্তা সিলভেস্টারের কাছে এসেছে ঠাকুরমার একখানি পত্রের

আকারে, এক স্নেহশীলা ভগিনীপ্রতিমা যুবতীর মুক্তোর মত সুন্দর হস্তাক্ষরে।

জাহাজখানা আসছে। ওর খোল চোখে পড়ছে এবার। পশ্চিম আইসল্যাণ্ডের পাহাড়ঘেরা খাঁড়িগুলোর তদারকি করতে ও আসে মাঝে-মাঝে, অমনি এ-অঞ্চলের যাবতীয় মাছ-ধরা বোটের যাবতীয় নাবিকের চিঠিপত্রও নিয়ে আসে।

জাহাজ আসছে, তার আগেই এসে পড়ল একটা হাওয়া। সমুদ্রবক্ষ মৃতবৎ নিশ্চল ছিল এতক্ষণ, এইবার এক এক জায়গায় চঞ্চল হয়ে উঠল কথঞ্চিৎ। আয়নার বুকে ঝিলিমিলি ঝিলিক খেলছিল ম্রিয়মাণ সূর্যালোকের, এইবার তার জায়গা দখল করল নীলচে-সবুজ নানান-রকম নক্সা। কোনটা দীর্ঘ লেজের মত প্রসারিত হয়ে গিয়েছে সুদূরে। কোনটা হাতপাখার মত ছড়িয়ে পড়ছে এধারে ওধারে। আর সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে তুলছে একটা সির সির সাড়া। সমুদ্র জেগে উঠছে। কতদিনের মূর্চ্ছার অবসান সূচনা হচ্ছে ঐ সিরসিরানিতে।

আকাশ মুখ ঢেকেই ছিল এতক্ষণ। ধূসর ঘোমটা হঠাৎ গুটিয়ে প্রান্তলীন হ'ল দিগন্তের কোলে। আকাশ হ'ল নির্মল! চক্রবালের গায়ে গায়ে খাড়া হয়ে উঠল বাষ্পের প্রাচীর। দু'খানা আদি-অন্তহীন কাচের চাদর—একখানা উপরে; তার নাম আকাশ, আর একখানা নীচে, তার নাম সাগর; এই দুইয়ের মাঝখানে বন্দী ঐ ধীবরেরা। এখন আর মলিন চেহারা নয় কাচ খণ্ড দুটির। উপরে যা কুয়াশা সঞ্চিত হয়েছিল, কে যেন তা মুছে নিয়েছে ওদের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনবার জন্য। আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছে যে তা শুভসূচক হতে পারে না।

এদিকে নানা দিক থেকে সমুদ্রবক্ষ অতিক্রম ক'রে ঐ স্টিমারকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে যাবতীয় জেলে-বোট। ফরাসীদেশের যত বোট এসেছে মাছ ধ'রবার জন্য, ব্রিটন বোট, নর্মান বোট, বুলোঁর বোট, ডানকার্কের বোট—এ-জাহাজের সঙ্গে মুলাকাত সকলেরই করা চাই। দেখতে দেখতে ক্রুইজারখানার চারদিকে বোটে বোটে ভিড় জ'মে গেল একটা। এখন তাদের গতি দ্রুত, মাছ ধরার সময়কার ধীরেসুস্থে ভেসে-

চলার ভঙ্গিমা এখন তারা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, উঠতি হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে।

হঠাৎ দূরে ঐ আইসল্যাণ্ডকে দেখা যায় না? দ্বীপটাও কি ক্রুইজারের কাছে ছুটে আসতে চাইছে না কি? সমুচ্চ গিরিমালা, সবুজের স্পর্শহীন ন্যাড়া প্রস্তরপ্রাচীর—আকাশ থেকে যাদের মাথায় কখনও কিরণবর্ষণ করে না সূর্য। সামান্য যেটুকু আলো তারা পায়, তা এই সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রতিফলিত মরা আলো।

জাহাজখানা থেমে পড়েছে। আইসল্যাণ্ডিয়া বোটগুলি ঘিরে ধরেছে তাকে। প্রত্যেক বোট থেকে মোচার খোলার মত ছোট ডিঙ্গি এক একখানা ছুটে চলেছে জাহাজের দিকে। সে-সব ডিঙ্গির মাঝিদের কী চেহারাই দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র পরিক্রমার ফলে! মুখে একমুখ লম্বা দাড়ি, পরনে যা পোশাক, তা প্রায় প্রস্তরযুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। সবে মিলিয়ে লোকগুলোকে বাহ্যতঃ ধরতে গেলে গুণ্ডার মতই ক'রে তুলেছে।

জাহাজের কাছে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু আবদার আছে। ওষুধ, খাবার, চিঠি, কত কী। ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা তাদের।

আইসল্যাণ্ডিয়াদের জন্যে অনেক চিঠি এবার এনেছে জাহাজখানা। একমাত্র 'মেরী' বোটের জন্যই দু'খানা। মসিয়ঁার ইয়ান গেয়সের একখানা, মসিয়ঁার সিলভেস্টার মোয়ঁার একখানা। এসেছে ডেনমার্কের রিকিয়াভিক বন্দর ঘুরে। সেই বন্দর থেকেই এই ক্রুইজার ভার নিয়েছে চিঠি দু'টোর।

চিঠির দায়িত্ব যার উপরে, সে ব্যাগ থেকে বা'র করছে সব চিঠি। যে-মোটা কাপড় দিয়ে জাহাজের পাল তৈরি হয়, এই ব্যাগও সেই কাপড়েরই। জল ঢোকে না ভিতরে। এই সাময়িক পোস্টমাস্টার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে অনেক চিঠির ঠিকানা পড়তে, লেখকলেখিকারা অনেকেই ত খুব পাকা লিখিয়ে কিনা!

হঠাৎ কাপ্তেন চেঁচিয়ে উঠলেন—"জলদি! জলদি! পারা নেমে যাচ্ছে"। সমুদ্রের বুকে এতগুলো মোচার খোলা জমায়েত দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এই ভয়াবহ সমুদ্র! এতগুলো জেলে বেঘোরে মারা পড়বে হঠাৎ ঝড় উঠলে।

যা হোক, যে যার বোটে ফিরল নিরাপদেই। এইবার চিঠি পড়ার পালা। এটাও খুব সোজা ব্যাপার নয়। কারণ পাঠকেরাও খুব পাকা পড়ুয়া নয় কেউ। ইয়ান আর সিলভেস্টার সাধারণতঃ এক সাথে ব'সেই চিঠি প'ড়ে থাকে। অন্যদের থেকে তফাতে, হাতে হাতে জড়া-জড়ি ক'রে, মধ্যরাত্রির সূর্যের আলোতে তারা চিঠি পড়তে লাগল, যে-চিঠি পেইম্পলের পার্কের ধারে গ্রানাইট পাথরের বাড়ীতে জানালার ধা'রে বসে গৌর লিখেছিল, মোয়্যাঁ ঠাকুরমার বয়ান অনুযায়ী।

"লেখাটা সুন্দর নয়?"···সিলভেস্টার ধূর্ত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ইয়ানকে। লেখা যে গৌরের, তা ত সে জানে! আর গৌরের সঙ্গে বিয়ে হয় ইয়ানের, এ ত তার অনেকদিনের সাধ!

ইয়ানও আন্দাজ করেছে—কার লেখা এই চিঠি, সে মুখ ফিরিয়ে কাঁধ নাচা'ল একটু। সিলভেস্টারের কথায় আর ইঙ্গিতে গৌরের নাম এত বেশী উঠছে আজকাল যে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে সে।

সিলভেস্টার সযত্নে চিঠিখানা ভাঁজ করল, তারপর জামার ভিতরে, বুকের ঠিক উপরেই সেখানি রেখে দিল। মনে সে দুঃখ পেয়েছে ইয়ানের ঐ নিস্পৃহ কাঁধ নাচানোর দরুণ। "নাঃ, ওদের বিয়ে হবে না বোধ হয়।" কিন্তু কেন? ইয়ানের মন এমন বিগড়ে গেল কেন? সেই নাচের মজলিসে ইয়ানের ব্যবহার ত' নিজ চোখে দেখেছিল সিলভেস্টার!

ক্রুইজার তখনো যায়নি। তার ঘড়িতে রাত বারোটা বাজল। তখনও তারা বোটের ছাদে ব'সে আছে। দেশের কথা ভাবছে, প্রিয় জনের কথা ভাবছে। হাজার রকমের কথাই ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে মনোরম।

এদিকে সমুদ্রজলে একটুখানি অঙ্গ ছুঁইয়ে সূর্য আবার ঊর্ধ্বগামী হয়েছে আকাশে। প্রভাত হ'ল।

চেহারা পালটে ফেলেছে, রংও। আইসল্যাণ্ডের এই সূর্য। নতুন দিনের সূচনা যা দেখিয়েছে, তা অশুভ। আজ আর ঘোমটা নেই তার মুখে, সমুজ্জ্বল কিরণছটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সূর্য থেকে দূর দূরান্তরে,

আকাশের কান্তারে আলোর স্রোত হাজার খাত বেয়ে ঢেউ তুলে ছুটেছে যেন।

এইরকম সূর্য দেখলেই ঝড়ের আশঙ্কা করে আইসল্যাণ্ডিয়ারা।

গত কয়েকটা দিন খুব শান্তই ছিল। বরাবর শান্তই থাকবে সমুদ্র, এমনটা আশা করা যায় না, একটা পরিবর্তন আসবে, তা জানা ছিল। তাই ভয় তারা পেলো না, পায় না তারা কখনো। বাতাস উঠেছে দেখে, তারা পরস্পরের থেকে দূরে স'রে যেতে শুরু করল। সারা রাত এক সঙ্গেই ছিল সব বোট।

এইবার তারা এক একটা এক এক দিকে ছুটেছে, ছত্রভঙ্গ সৈন্য-দলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যেমন ছোটে। বিপদ আসন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আকাশের চেহারায় তা স্পষ্ট মালুম।

বাতাসে জোর লাগছে। আরও, আরও। বোটগুলোও কাঁপছে, মানুষগুলোও কাঁপছে। ঢেউ এখনো ছোট ছোট। একটার পিছনে তাড়া ক'রে যাচ্ছে আর একটা, ঘাড়ে পড়ল ব'লে! দু'টো মিলে একটা হয়ে গেল ব'লে! সাদা ফেনার একটা পাতলা চাদর আগেই চাপা দিয়েছে তাদের। সেই চাদর হঠাৎ ফেটে যাচ্ছে এইবার, ধোঁয়ার আকারে ছিটিয়ে উঠেছে শীকরকণা। সমুদ্র ফুটছে নাকি? পুড়ছে? মিনিটে মিনিটে উচ্চতর গ্রামে চ'ড়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ, লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে ওঠে যে-রকম।

মাছ ধরার চিন্তা এখন মাথায় উঠেছে, বোট বাঁচাতে পারলে হয় যে! সূতো বঁড়শি টেনে তোলা হয়েছে সেই কখন! সবাই চাইছে ছুটে পালা'তে। কেউ ফিয়র্ডের দিকে. তবে বিপদ ঘটবার আগে সেখানে পৌঁছানো যাবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন। অন্য কেউ বা আইস-ল্যাণ্ডের দক্ষিণ অন্তরীপ ঘুরে খোলা সমুদ্রে পড়বার চেষ্টা করছে, যাতে পাল তুলে দিয়ে ঝড়ের আগে আগে উড়ে যাওয়া যায়। এক বোট থেকে অন্য বোট এখনও একটু একটু নজর চলে। বড় দু'টো ঢেউ-সম্রাটের মাঝের খোলটাতে হয়ত একখানা পাল চোখে পড়ছে পলকের জন্য; অসহায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বস্তু একটা, তবু তা নিজের মাথা খাড়া রেখেছে কোন রকমে।

পশ্চিম দিগন্তে জমাট বেঁধে রয়েছে পর্বতাকার একটা মেঘমালা।

তার মাথাটা ফেটে গেল হঠাৎ। আর খণ্ড ছিন্ন এক একখানা মেঘ আকাশ-প্রাঙ্গণে ছুটে চলল রণতুরঙ্গের মত। মেঘপাহাড়ের নিম্নাংশটা এইবার বাতাসে ছড়াতে লাগল, ফুলতে লাগল, পর্দায় পর্দায় উন্মোচিত হ'তে থাকল, কালো যবনিকার মিছিলে ছেয়ে গেল হ'লদে আকাশ।

বাতাস তবু বাড়ছে, তবু বাড়ছে, তবু-তবু—

ক্রুইজারখানা পালিয়েছে আইসল্যাণ্ডের উপকূলে আশ্রয় নেবার জন্য। উত্তাল সমুদ্রে জেলে বোটগুলোই শুধু এখন। উত্তাল সমুদ্র! ক্রুদ্ধ সমুদ্র! ভয়াল মূর্তি, বীভৎস বর্ণ তার। বোটগুলির পরস্পরের ভিতর ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, একে একে পরস্পরের দৃষ্টিসীমার বাইরেই চ লে যাচ্ছে তারা।

পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে ঢেউয়েরা, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘাত লেগে মিলে মিশে বিরাট আকার পরিগ্রহ করছে। মাথা তাদের যত উঁচু হয়ে উঠছে, পায়ের নীচে গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে তত গভীর।

আগের সন্ধ্যায় কী গভীর প্রশান্তি ছিল এই সমুদ্রে! আজ সব কিছু বিক্ষুব্ধ। জলপ্রান্তরকে চ'ষে উলটেপালটে দিয়ে গিয়েছে যেন এক অনৈসর্গিক লাঙ্গল। যেখানে ছিল অটুট নীরবতা, সেখানে এখন কর্ণ-বিদারী অট্টরোল। আথাল পাথাল জল রুদ্রদেবতার জটার মত ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিকে। অন্ধ এক সংহারের আবেগ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে কয়েকখানা জেলে বোটের উপরে।

মেঘের পরে মেঘ আসছে পশ্চিম থেকে, একটাকে ঢেকে ফেলছে আর একটা, দ্রুত ছুটছে, রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে, সবকিছুকে অস্পষ্ট ক'রে দিয়ে। এখানে ওখানে দুই একটা ফাঁক এখনো আছে, তার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে উপর আকাশের হলুদ রং। সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে ঝ'রে পড়ছে এই প্রলয়রণাঙ্গনে।

দুপুর নাগাদ মেরী নিজেকে একটা দুর্গে পরিণত ক'রে ফেলেছে। এ-রকম দুর্যোগে আত্মরক্ষা করার অন্য উপায় কিছু নেই। বড় পাল গুটিয়ে ফেলেছে। ছাদে ওঠার দরোজা এঁটে বন্ধ করেছে। অতি নমনীয়, অত্যন্ত ক্ষিপ্র এই তরণীখানি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে খেলা ক'রে চলেছে ঠিক শুশুকের মত। সমুখের ক্ষুদে পালটুকু তুলে দিয়ে বাতাসের আগে আগে সে উড়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক চিলের মত অনায়াসে।

মেঘাচ্ছন্ন গগনকে দেখাচ্ছে গম্বুজের মত, চারিধার থেকে চেপে আসছে যার বৃত্তাকার প্রাচীর। হঠাৎ মনে হবে মেরী বন্দী হয়ে পড়েছে একটা নিথর অনড় আবেষ্টনের ভিতরে। তা যে সত্যিই নয়, বোটখানা যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে আন্দোলিত সিন্ধুবক্ষ মথিত ক'রে, তা উপলব্ধি করতে হলে দরকার আশেপাশে বেশ কিছুক্ষণ স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে থাকা। বিশাল বিশাল ধূসর আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তের কোল থেকে, জলরাজ্যকে ঢেকে দিচ্ছে কফিন-ঢাকা চাদরের মত। সেই ঢাকনার তলায় চাপা যাতে না পড়তে হয়, তারই জন্য প্রাণ নিয়ে ছুটেছে মেরী, দ্রুত, আরও দ্রুত, আরও দ্রুত—

চলেছে এই ভাবেই সারা দীর্ঘদিন। অবশ্য ভাবটা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তরঙ্গ আসছে একটার পর একটা, আকারে আয়তনে বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে উঠেছে তারা। গিরিশৃঙ্গের পরে গিরিশৃঙ্গ, অন্তহীন গগনচুম্বী পর্বতমালা যেন। ছুটো শৃঙ্গের মধ্যে উপত্যকা যেখানে, ভয় সেইখানেই। বেড়ে চলেছে গতির মত্ততা, বেড়ে চলেছে ঐ আকাশের আঁধার, প্রলয় কলরোলকে শোনাচ্ছে দৈত্যসেনার একটানা গর্জনের মত।

অতি-ভয়াবহ আবহাওয়া, তবু ছুই একজনকে বাইরে থাকতেই হচ্ছে। পাহারা না দিয়ে উপায় নেই। কখন কী ঘটে যায়, ঠিক কী? বিশাল জলবিস্তার সামনে, যত পার দৌড়ে যাও। এ দৌড়েতে ক্ষতি নেই মেরীর। মাছ-ধরার এই কয়েকটা মাস মেরী আইসল্যাণ্ডের পশ্চিমবর্তী সমুদ্রেই ত কাটিয়েছে এবার! দেশে ফেরার সময় এই পথটা তাকে পাড়ি দিতেই হ'ত। সেই পাড়ি জমানোর ব্যাপারেই সাহায্য করছে এই মেরুঝঞ্ঝা।

ইয়ান আর সিলভেস্টার ছু'জনে মিলে হাল ধরেছে। লোহার মোটা রিং আছে ছাদে বসানো, তারই সঙ্গে ওদের কোমর দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। তা না হ'লে কখন তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত ঐ ঢেউ সম্রাটেরা। হাল ধ'রে ব'সে আবার তারা জাঁ-ফ্রাসোঁয়ার গান গাইছে। একটা নেশায় যেন মাতাল হয়ে উঠেছে তারা। ছোটার নেশা। গতিবেগের নেশা। সেই নেশার বশে গলা ফাটিয়ে সুর খেলিয়ে যাচ্ছে তারা। মাঝে মাঝে উচ্চ হাসি। হাসির কারণ শুধু এই যে কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না, এত কাছাকাছি ব'সেও।

"মসিয়ার ইয়ান, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম আপনাকে—" [পৃঃ ৩৮

ছাদের দরজা আদ্ধেক খুলে কাপ্তেন গর্মিয়ার তাঁর দাড়ি-ঢাকা মুখ বা'র করলেন একবার—"ওহে ছোকরারা, উপরে গুমোট লাগছে না ত?"

ঠাট্টা আর কি! গুমোট? এই উদ্দাম ঝড়ের সময়? না মালিক, না, আর যে জিনিসের অভাব থাকুক, হাওয়ার অভাব ছাদের উপরে নেই। অভাব নেই আরও দুই একটা জিনিসের। সেগুলো হ'ল সাহস আর সহিষ্ণুতা। ভয় তাদের করছে না, কারণ বোটখানা যে দারুণ মজবুত, তা তারা জানে, আর এই প্রলয় দোলায় অবিচল থাকার তাগদ যে তাদের লোহার দেহে বিলক্ষণ আছে, সে বিষয়েও তারা সচেতন। আরও জোর তাদের মনে, নীচে কেবিনের কোণে অধিষ্ঠান করছেন মৃন্ময়ী মেরী মাতা। চল্লিশ বছর ধ'রে প্রতিবারের সমুদ্রযাত্রায়ই ত এমনিধারা সংকটে তিনি রক্ষা করেছেন তাঁর ভক্তদের। এবারও অবশ্যই করবেন। না করবার কারণ কী থাকতে পারে?

ভয় নেই, বিপদ কেটে যাবে। ধরো গান গলা ছেড়ে—জাঁ-ফ্রাসোঁয়া!

জাঁ-ফ্রাসোঁয়া দ্য ন্যান্তে—এ—এ—
জাঁ ফ্রাসোয়াঁ—আ—
জাঁ—ফ্রাসোঁয়া—আ—আ—আ—

বেশীর ভাগ সময়ই নজর চলছে না দুই-চার ফুটের বেশী। দূর সমুদ্রে সব-কিছুই একাকার হয়ে গিয়েছে আকাশছোঁয়া তরঙ্গমালায়। এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সদাই যেন বন্দী ওরা, অবশ্য সে-গণ্ডীর ভিতরকার পরিবেশ ক্রমাগতই পালটাচ্ছে। উত্তর পশ্চিমেই কেবল মাঝে মাঝে চিড় খেয়ে যাচ্ছে ঐ ঢেউয়ের প্রাচীর, আর সেই চিড়ের ভিতর দিয়ে হা-হা ক'রে ছুটে আসছে ভিন্ জা'তের এক দমকা ঝড়, তারই পিঠ-পিঠ দিগন্ত থেকে ঠিকরে আসছে আলোর ঝলকানি একটা, রাঙ্গিয়ে তুলছে সাদা ফেণায় মণ্ডিত তরঙ্গশীর্ষগুলি। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গুম্বজে আঁধার হয়ে যাচ্ছে আগের চেয়েও গাঢ়, আগের চেয়েও নিবিড়।

পৃথিবী কি ধ্বংসই হবে আজ? এই দানবীয় প্রলয় নির্ঘোষকে ত মনে হয় তারই পূর্বাভাস। এ-নির্ঘোষে ওতপ্রোত হয়ে আছে হাজার রকমের স্বর। কোন স্বর বাঁশীর নিঃস্বনের মত, কোন স্বর বা ডমরু-

ধ্বনির মত কানে এসে বাজে। দু'টোই হাওয়ার স্বর। হাওয়া! এই ধ্বংসযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর ঝঞ্ঝাদেবতা। তাঁর স্বর কিন্তু ভীতির সঞ্চার করে না তেমন, যেমন করে জলদেবতার শঙ্খনাদ। সেটা যে একেবারে কানের কাছে! মাথার উপরে! তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে লাফিয়ে পড়ছে বোটের ছাদে, গড়িয়ে যাচ্ছে চড়াৎ-চড়াৎ শব্দ তুলে। বেচারা জলযান কেঁপে কেঁপে উঠছে, যেন বিরাট কোন দৈত্যের হাতের চাপড় খেয়ে।

ইয়ান আর সিলভেস্টার, দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে নিয়েছে লোহার রিংয়ের সাথে, হাল ধ'রে ব'সে আছে তেল-খাওয়ানো চামড়ার পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে। আলকাতরা-মাখানো ফিতে দিয়ে সে-পোশাক গলায় আর কব্জিতে বাঁধা, যাতে তার ভিতর জল ঢুকতে না পারে একটুও।

মাথার উপর দিয়ে প্লাবন ব'য়ে যাচ্ছে যখন, তখন বাধ্য হয়েই তারা নীরব। তখন কথা কইতে গেলেই নোনা জল মুখে ঢুকবে! কিন্তু ঢেউ যেমনি স'রে যাচ্ছে, অমনি যুগল কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে উঠছে জলকল্লোলের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে—

জাঁ-ফ্রাসোঁয়া দ্য ন্যান্তে—এ—এ—
জাঁ-ফ্রাসোঁয়া, জাঁ-ফ্রাসোঁয়া—আ—আ—

৬

আগস্টের মাঝামাঝি আইসল্যাণ্ডিয়াদের বোটগুলি একে একে ফিরতে লাগল ব্রিটানির বিভিন্ন বন্দরে। প্রায় সবাই ফিরল নিরাপদে, দু'খানি বোট ছাড়া। মেরুঝঞ্ঝার বলি হয়েছে তারা, পারে নি নিজেদের বাঁচাতে।

তবে 'মেরী' বেঁচে ফিরেছে, গৌরের সেই পরম সান্ত্বনা। ইয়ান আর সিলভেস্টার দু'জনেই অক্ষতদেহে ফিরতে পেরেছে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সিলভেস্টারের প্রিয়জনদের ভিতরে গৌরও অগ্রগণ্য একজন। ঠাকুরমার পরেই তার জীবনে গৌরের প্রভাব সমধিক।

সিলভেস্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল গৌরের, কিন্তু ইয়ানের সঙ্গে হ'ল না। ইয়ান তাকে এড়িয়েই চলছে। পেইম্পালের প্রতি রাস্তায় সে

টহল দেয়, প্রতি হোটেলে সে আড্ডা জমায়, মিভেলদের বাড়ির দোর দিয়েই হয়ত দুই চার বার হাঁটে রোজ, কিন্তু কখনো ঢোকে না সেই দোরের ভিতর, বা চ'লে যাওয়ার সময় উপরের জানালার পানে তাকিয়েও দেখে না একবার। দেখলে অনিবার্যভাবেই গৌরের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত।

যাক, ইয়ান এল না, কিন্তু তবু দেখা হ'ল একদিন। একটা করুণ ব্যাপারের উপলক্ষে। ব্যাপারটা এই—সিলভেস্টারকে চ'লে যেতে হ'ল। ফরাসী যুবক মাত্রেকেই পাঁচ বৎসর কাল নৌবাহিনীর কাজ করতে হয়। এটা একেবারে বাধ্যতামূলক। এবার যে ওকে যেতে হবে, তার ইঙ্গিত গত বৎসরই মিলেছিল। সেই থেকে বুড়ী ইভোন মোয়াঁ অনেক চেষ্টা করেছেন সরকারী এই জাঁতাকল থেকে একমাত্র নাতিটিকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য। তার পক্ষ থেকে পেইম্পালের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একটা দরখাস্তও দিয়েছেন উপরওয়ালাদের কাছে। দরখাস্তটির মর্ম এই যে মোয়াঁবুড়ী একান্ত সহায়সম্বলহীনা। ঐ নাতিটি যদি নৌবাহিনীর কাজ করতে গিয়ে মারা পড়ে তবে শোকে দুঃখে না হোক, না খেয়েই মারা যাবে বুড়ী। অতএব সিলভেস্টারকে রেহাই দেওয়া হোক নৌবাহিনীর চাকরি থেকে।

দরখাস্তে কোন ফল হয় নি। উপরওয়ালারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে নিঃস্ব এবং পতিপুত্রহীনা ব'লে ইভোন মোয়াঁকে অনেকদিন থেকেই পেন্‌সন্ দিচ্ছেন সরকার, কাজেই নাতির ভালমন্দ ঘটলেও বুড়ীর না খেয়ে মরার কথা নয়।

অতএব যেতেই হচ্ছে সিল্‌ভেস্টারকে। গেল আরও অনেক যুবকই। ব্রেস্ট থেকে গাড়ি এসেছে এই রংরুটদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যে-রাস্তায়, লোকারণ্য আজ সেখানে। প্রতিটা ছেলেকে বিদায় দেবার জন্য নরনারী এসেছে গড়ে দশ জন। সিলভেস্টারকে জড়িয়ে ধ'রে আছেন তার ঠাকুরমা, প্রচুর কাঁদছেন তিনি, একটু একটু কাঁদছে সিলভেস্টারও। পাশে দাঁড়িয়ে গৌরও দু'চোখ শুকনো রাখতে পারে নি।

ইয়ান এল, বন্ধুকে আলিঙ্গন করল, মোয়াঁ বুড়ীকে সান্ত্বনার কথা বলল, দুই একটা, কিন্তু গৌরের দিকে চোখই ফেরা'ল না একবারও।

গাড়ি ছাড়ল এইবার। ব্রেস্ট শহরে আছে সেনাবারিক, সেইখানে এখন কিছুদিন থাকবে এই রংরুটেরা। লড়াই করার তালিম নেবে। অবশেষে একদিন জাহাজে চ'ড়ে চ'লে যাবে সাতসমুদ্রপারে, সুদূর প্রাচ্যে, চীনাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। পাঁচ পাঁচটা বৎসর থাকবে সেখানে। যদি তার মধ্যে ম'রে না যায়, তবে ফিরবে দেশে, যেমন ইয়ান ফিরেছে, ফিরেছে অনেক অনেক আইসল্যাণ্ডিয়া।

হ্যাঁ, ফিরেছে অনেকে। আবার অনেকে কিন্তু ফেরেও নি। তাদেরই কথা স্মরণ ক'রে কেঁপে কেঁপে ওঠে মোয়াঁ বুড়ীর বুকখানা। তার যে আর কেউ নেই! একেবারে কেউ না! মেরী-মা কি দয়া করবেন তাকে? বুকের নিধিকে ফিরিয়ে দেবেন বুকে? আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে যিনি রক্ষা করেছেন ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে, ইচ্ছে করলে অবশ্য তিনি ইণ্ডোচীনের জলাজঙ্গলে চীনাবন্দুকের গুলি থেকেও রক্ষা করতে পারেন তাকে। করবেন কি সে-ইচ্ছে?

মোয়াঁ বুড়ী বাড়ি ফিরেই মেরীমাতার মৃন্ময়ী মূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে বসলেন। এখন থেকে পাঁচবৎসরকাল এইখানেই কাটবে তাঁর বেশীর ভাগ সময়।

* * *

এক পক্ষ পেরিয়ে যায়। ব্রেস্ট-এর ডিপোতেই রয়েছে সিলভেস্টার। কোন কিছুর সাথেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। তবু নিজের আচরণে নিখুঁত স্থৈর্য আর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় সে দিয়ে যাচ্ছে। জামার নীল কলার খুলে দিয়ে, লাল টুপিতে পালক লাগিয়ে দুলে দুলে তার দীর্ঘ দেহ যখন ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তখন ব্যারাকের অনেকেই তার গর্বী ভঙ্গিমা আর সুন্দর চেহারার তারিফ করে। বুড়ী ঠাকুরমার জন্য মন তার এখনো কাঁদছে, ব্যারাক-জীবনের কৃত্রিমতা আর আবিলতা তাকে স্পর্শ করে নি আজও।

ব্রেস্ট জায়গাটা শহর, আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রের মত জনমনুষ্যহীন নয়। প্রলোভন এখানে প্রতি রাজপথে। কিন্তু ঠাকুরমার আর মেরী গেয়সের চিন্তা অক্ষয় বর্মের মত ঘিরে রেখেছে তাকে। তার দেহমনের শুচিতা সে নষ্ট করে নি একদিনের জন্যও। অন্য রংরুটরা এজন্য হাসাহাসি

করে, কিন্তু তার সমুখে নয়। কারণ দৈহিক বলে সিলভেস্টারের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে না কেউ, তা তারা জানে।

এমনি কাটছে দিন। হঠাৎ একদিন আফিসে ডাক পড়ল তার, খবর দেওয়া হ'ল তাকে। চীনে যেতে হবে তার, ফর্মোসা স্কোয়াড্রনের অঙ্গীভূত হয়ে। এই হুকুমই যে হবে, তা তার জানা ছিল একরকম। যারা খবরের কাগজ পড়ে, তাদেরই মুখ থেকে সে শুনেছে—ফরাসী সাম্রাজ্যের ঐ অংশটাতে লড়াই থামবার কোন লক্ষণ নেই। লড়াই থামছে না, মানে সৈন্য মরছে। তারই মানে হ'ল এই যে নতুন সৈন্য পাঠাতে হবে সেখানে। তার মানে আবার এই দাঁড়ায় যে—

সাধারণতঃ বিদেশ যাত্রার আগে নতুন সৈনিকদের দুই চার দিনের ছুটি দেওয়া হয়, বাড়ি গিয়ে আত্মীয়জনের কাছে বিদায় নিয়ে আসার জন্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব হবে না, এই কথাই জানিয়ে দিলেন সেনানায়ক। কারণ আগামী পাঁচ দিনের মধ্যেই এই দলটাকে তল্পি-তল্পা গুছিয়ে নিয়ে জাহাজে চ'ড়ে বসতে হবে।

কত এলোমেলো চিন্তা তার মনে! কত বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত! আনন্দও হ'চ্ছে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবনা সম্মুখে দেখে। অজানার আহ্বান একটা শিহরণও জাগিয়ে তুলছে অন্তরে। তারপর যুদ্ধের উন্মাদনাও যে নেই, তা নয়। কিন্তু স্বদেশ স্বজন থেকে এই যে বিদায়, তার একটা বেদনাও ত আছে তেমনি! আর সে-বেদনার পরতে পরতে মেশানো একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক—'এই যে যাচ্ছি, আর নাও ত ফিরতে পারি!'

হাজার জিনিস মাথায় চক্কোর দিচ্ছে। আশে পাশে একটা দারুণ চাঞ্চল্য সাথীদের ভিতর। অনেকেই ত তারা চলেছে এই ফর্মোসা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে! চারিদিকে চাঞ্চল্য, কিন্তু সিলভেস্টার ঠাণ্ডা হয়ে মেজেতে ব'সে চিঠি লিখে ফেলল একখানা। পেনসিল দিয়েই লিখল। চিঠি ঠাকুরমার নামে—

দুই দিন বাদেই রেকুভ্রান্স-এর ব্যারাকে এক বৃদ্ধার আগমন। সবাই শুনল—ইনি সিলভেস্টারের পিতামহী। সিলভেস্টার অবশ্য তাঁকে আসতে বলে নি। শুধু বিদায়-সম্ভাষণই জানিয়েছিল চিঠি লিখে। কিন্তু সে-চিঠি পেয়েই বৃদ্ধার মনটা কেঁদে উঠল। কতদূরে চ'লে যাবে বাছনি, কত দিনের জন্য। ফিরে যখন আসবে, তখন তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা

তাকে কোলে টেনে নেবার জন্য, তারও ত ঠিক নেই কিছু। এ-অবস্থায় একবারটি শেষ দেখা না দেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় কি ?

বুড়ী মাটির তলা থেকে গোপনে-লুকানো সামান্য সঞ্চয়টুকু বা'র ক'রে নিয়ে সেই দিনই রওনা হয়ে পড়লেন ব্রেস্ট-এর দিকে।

সিলভেস্টারের সাথীরা ওর দৃপ্ত, উদাসীন মূর্তি দেখতেই অভ্যস্ত হয়েছে এ-কয়দিনে। আজ তার নতুন চেহারা দেখে ভারী মজা লাগল তাদের। রেকুভ্রান্সের রাজপথে সে হাঁটছে, বাহুলগ্না এক বৃদ্ধাকে নিয়ে। অতি কোমল স্নেহসিক্ত স্বরে কথা কইছে তাঁর সঙ্গে। খর্বকায়ার সঙ্গে কথা কইবার জন্য উন্নত শির তাকে নোয়াতে হয়েছে অনেকখানি। এ-দৃশ্য তাদের চোখে নতুন একেবারে।

পিজবোর্ডের ব্যাগে ভ'রে রবিবারের পোশাকটা, আর একটা বাড়তি টুপি এনেছিলেন ঠাকুরমা। সেইটি পরেই আজ তিনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন নাতির সঙ্গে।

এই কয়েকদিনে নাতির চেহারা আরও অনেক ভাল হয়েছে। কালো দাড়ি ছেঁটে দিয়েছে নাপিত, থুতনির নীচে সূচোলো ক'রে। ঐ রকমই এ-বছর ফ্যাশন নাবিকদের। সার্টের গলা খোলা, চুনট-করা। টুপি থেকে ফিতে ঝুলছে কয়েকটা, প্রত্যেকটা ফিতের প্রান্তে গিল্টির নোঙর গাঁথা এক একটা।

বুড়ী মোয়াঁ ত কয়েক মুহূর্ত হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন। এ যে হুবহু তার ছেলে পিয়ের মোয়াঁ! যে-পিয়ের মারা গিয়েছে আজ বিশ বৎসর হ'ল! সেও নৌ-সেনার সৈনিক ছিল। ঠিক এই পোশাকই পরত সে! আর চেহারা? পিয়েব যে নিজের চেহারাই দিয়ে গিয়েছে তার ছেলেকে, তা সঠিকভাবে আজই যেন উপলব্ধি করলেন পিয়েরের মা।

মনটা বিষাদে ছেয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। তার পরই অবশ্য সে বিষাদ কেটে গেল। মিলনের আনন্দে দু'টি হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে গেল। হাতে হাত বেঁধে সিলভেস্টার বেরিয়ে পড়ল ঠাকুরমাকে শহর দেখাবার জন্য। ঠাকুরমা তাকে হোটেলে নিয়ে ডিনার খাওয়ালেন। সে ঠাকুরমাকে ব্রেস্ট শহরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আলো-ঝলমল দোকান-পশারগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার মতলবে। আর পথ চলতে চলতে বুড়ী ঠাকুরমা কত যে মজার মজার পাড়া-গেঁয়ে গল্প শোনালেন নাতিকে;

সে ত হেসেই কুটিকুটি! পথচারীরা একবর্ণও বোঝে না বুড়ীর গল্পের। কারণ সে ত কথা কইছে—ব্রিটানির কথ্য ভাষায়!

তিনদিন ঠাকুরমা রইলেন সেখানে। স্বর্গীয় আনন্দে-ভরা পূরো তিনটি দিন। আনন্দ স্বর্গীয় বটে, তবে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাতে এমনভাবে মেশানো যে হাসতে হাসতে হঠাৎ এক একবার চোখ ছাপিয়ে উপচে পড়ে অশ্রুধারা। তিনদিন গেল, কা'ল জাহাজে উঠতে হবে সিলভেস্টারকে। তারপর আর নামতে পাবে না। আত্মীয়দেরও দেওয়া হবে না জাহাজে উঠে দেখা করতে।

সুতরাং আজই শেষদিন। আজ আর মজার গল্প মাথায় আসছে না ঠাকুরমার। কথা কইতে গেলেই কান্না আসছে। সিলভেস্টারের হাত ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে হাজারটা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন একে একে—"এ রকম ক'রো না, এইরকমটিই করবে সর্বদা।" এসব উপদেশ যে কার্যক্ষেত্রে পালন করা যাবে না, তা বিলক্ষণ জানে সিলভেস্টার। তবু সে ঘাড় নেড়ে নীরবে সম্মতি জানিয়ে যাচ্ছে। জানে যে কথা কইবার চেষ্টা করলেই সেও কেঁদে ফেলবে।

শেষ পর্যন্ত দু'জনে মিলে এক গির্জায় গিয়ে ঢুকল। সেইখানে পাশাপাশি ব'সে প্রার্থনা করল দীর্ঘকাল ধ'রে।

ঠাকুরমা বিদায় নিলেন সন্ধ্যার ট্রেনে। পয়সা বাঁচাবার জন্য পায়ে হেঁটেই দু'জনে স্টেশনে এসেছিলেন। ঠাকুরমার পেস্টবোর্ডের ব্যাগ সিলভেস্টার বইছে আজ। তা ছাড়া, ঠাকুরমাকেও প্রায় ব'য়েই নিয়ে যাচ্ছে সে, এমনভাবে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন তার বাহুর ভিতরে। বড় শ্রান্ত! বড় শ্রান্ত আজ বেচারী বুড়ী। তিন চা'রদিন তীব্র উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কেটেছে, আজ এসেছে তারই প্রতিক্রিয়া। ছিয়াত্তর বছরের বার্দ্ধক্য যেন আজ বিরাট বোঝার মত পিঠে চেপে ব'সেছে তাঁর।

টিকিট, খাবারের ঠোঙ্গা, দস্তানা—এসব সামলাতে সামলাতে তখনও ধরা-গলায় কী সব পরামর্শ নাতিকে দিচ্ছেন তিনি। রেল-কর্মচারী কেউ একজন হেঁকে উঠল—"বুড়ী মা, যাবেন ত উঠে পড়ুন—"

তাড়াতাড়ি সিলভেস্টার তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে দিল। বাঁশী বাজল, ঠাকুরমা চ'লে যাচ্ছেন সমুখ দিয়ে। মাথার টুপি হাতে নিয়ে তাই

আন্দোলিত করছে সিলভেস্টার। ঠাকুরমা তাঁর থার্ড-ক্লাস কামরার জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়েছেন, হাতের রুমাল উড়িয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে যাচ্ছেন শেষ মুহূর্ত-পর্যন্ত। "অ-রিভোয়া! অ-রিভোয়া"—যতক্ষণ বিলীয়মান প্লাটফর্মে কালো-নীল পোষাক-পরা মূর্তিটিকে চেনা যাচ্ছে। ঐ মূর্তিই তাঁর শেষ বংশধরের। তাঁর স্নেহের নাতির—যুদ্ধে যাচ্ছে নাতি—যুদ্ধে—

দেখ, দেখ, ভাল ক'রে দেখ বেচারী বুড়ী, তোমার ছোট্ট সিলভেস্টারকে। ঐ যে আবছা মূর্তিটা অতি দ্রুত ছোট হয়ে আসছে তোমার চোখের সামনেই, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ ওর উপর। যাচ্ছে—মুছে যাচ্ছে—অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে—আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—তার হাতের ফিতেওয়ালা টুপিটাও না—

আর দেখা যাচ্ছে না, বুড়ী টলতে টলতে ব'সে পড়ছে আসনে। নতুন কান-ঢাকা টুপিটা কুঁকড়ে গেল, তা খেয়াল করছে না বুড়ী। কাঁদছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে—

সিলভেস্টার ওদিকে মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। গাল বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরছে তার অশ্রু। হেমন্তসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আলো জ্ব'লে উঠছে এধারে ওধারে চারধারে, নাবিকেরা উৎসবে মাতবে এবার। কোনদিকে তার নজর নেই। ব্রেস্ট শহরের মাঝখান দিয়ে সে চ'লে গেল। পুল পেরিয়ে ঢুকল গিয়ে রেকুভ্রান্স ব্যারাকে, যেখানে তাদের আস্তানা—

বিছানায় গুটিসুটি শুয়ে সে কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে—সারা রাত কেঁদেই চলেছে—ঐ বুড়ী ঠাকুরমাকে সে হয়ত দেখবে না আর কোনদিন—

অথৈ সমুদ্র, অপার সমুদ্র, অজানা সমুদ্র। আইসল্যাণ্ডের সমুদ্র তার চেনা, এ তার চেয়ে অনেক বেশী নীল। জাহাজ থামছে না কোথাও, থামবার কথাই নয় তার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রংরুটদের সে পৌঁছে দেবে দূর প্রাচ্যে।

দ্রুতবেগে চলেছে জাহাজ। অবিরাম চলেছে, গতিবেগ অব্যাহত রেখে, হাওয়ার ওলটপালট বা সমুদ্রের মেজাজের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে। সিলভেস্টার নীচে থাকে না। মাস্তুলের গায়ে "কাকের বাসা" নামক যে

মাচা আছে পর্যবেক্ষণের জন্য, ওর আস্তানা সেইখানে। ভিড়ের ভিতর থাকতে হলে কষ্ট হ'ত তার, নীচের ডেক ত রংরুটে গিজগিজ করছে।

ওর মনে এক ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য—ব্রিটানি থেকে প্রত্যহ সে আরও দূরে, আরও বেশী দূরে স'রে যাচ্ছে। এক এক সময় সে হিসাব করে। কত—কত দিন ধ'রে জাহাজ ছুটেই চলেছে এমনি অব্যাহত অবিরাম দ্রুত বেগে! কত—কত দূরই না সে এসে পড়ল প্লাউবাজলানেকের খড়ে-ছাওয়া পাথরের ঘর থেকে। টিউনিস পেরিয়ে, পোর্ট সায়েদ পেরিয়ে, মরু প্রান্তরের বুকে শীর্ণ সেই জলধারা বেয়ে যার নাম সুয়েজ খাল—

নীচের ডেক একটা অগ্নিকুণ্ড যেন। অসহ্য গরমে অসংখ্য মানুষ কাৎরাচ্ছে নিয়ত। সমুদ্রের জল, আকাশের হাওয়া, সর্বব্যাপী সূর্যালোক —এদের সৌন্দর্য-গরিমাও যেমন আশ্চর্য, মানুষকে অবসাদে ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ। মরণশীল মানুষের কাছে ওদের গরিমা যেন মালুম হয় নির্মম একটা পরিহাসের মত।

উপরে ব'সে ব'সে একদিন সে দেখল—ছোট পাখির একটা ঝাঁক—আকাশ-ঢাকা মেঘমালার মত বিপুল আয়তনের একটা ঝাঁক—হঠাৎ এসে ঝুপ ঝুপ করে পড়তে লাগল জাহাজের উপরে। এমন পাখি এরা কেউ দেখেনি আগে। তারা এসে পড়ল, এমন অবসন্ন তারা যে নড়ে না চড়ে না। নাবিকেরা সৈনিকেরা প্রত্যেকে দুই একটা ক'রে কুড়িয়ে তুলল। তাদের হাতের ভিতরেই একে একে মরতে লাগল পাখিগুলো। হাজারে হাজারে মরল তারা সেদিন, জাহাজের যত্র তত্র। লোহিত সমুদ্রের মারাত্মক সূর্য বলি গ্রহণ করেছেন ওদের ক্ষুদ্র প্রাণগুলি।

ঝড়ের তাড়নে তারা ছিটকে এসে পড়েছে মরুভূমির ওপার থেকে। নীল সমুদ্রের বুকে অন্য আশ্রয় না দেখে ওরা জাহাজে এসে নেমেছিল, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। নামবার আগেই প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র জীবগুলির!

সিলভেস্টার দেখল তাদের নিয়তি। ভাবতে লাগল—জীবন-যুদ্ধের জ্বালা, তারও জীবন-শক্তি ঐভাবে নিঃশেষ ক'রে দেবে না ত?

তারপর বহু—বহুদিন কাটল সিলভেস্টারের—জাহাজ পাল তুলে চলেছে পরিবর্তনহীন একটানা সমুদ্রের বুক চিরে। কোথাও কোন জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ে না। কেবল ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একটা উড়ুক্কু মাছ ছাড়া।

তারা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে একটুখানি। আবার উড়তে উড়তে ভুচ ক'রে তলিয়ে যাচ্ছে অতল জলে।

৭

বৃষ্টি! মুষলধার বৃষ্টি! কালো আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন পৃথিবীর উপর, সেই আকাশ থেকে হাতীর শুঁড়ের মত মোটা ধারায় বৃষ্টি ঝরছে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, দিনের পরে দিন। ভারতবর্ষ এটা।

একটা বোট যাচ্ছিল ডাঙ্গার দিকে। তার নিয়মিত দাঁড়ীদের ভিতর একজন অসুস্থ। সিলভেস্টার বলল সে যাবে, আপত্তি হ'ল না সার্জেণ্টের। তাই ভারতের মাটি স্পর্শ করার সুযোগ হ'ল ওর।

মাথার উপর যেন ছাতা ধ'রে আছে পত্রবহুল বনস্পতি, তবে সেই পাতার ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টিও পড়ছে অঝোর ঝোরে, গরম, চড়ব'ড়ে বৃষ্টি, যা মিইয়ে না দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলে মানুষকে। চারদিকে নতুন জিনিস সব, আশ্চর্য জিনিস। জমকালো-রকম সবুজ প্রত্যেকটা উদ্ভিদ, গাছের পাতাগুলো যেন এক একটা অতিকায় পালক। মানুষগুলোর কী বড় বড় চোখ, ভেলভেটের মত কোমল! সে সব চোখ যেন নিজের ভারেই নিজে বুজে আসতে চায়। বাতাসে কস্তুরী আর কুসুমগন্ধ।

এইটুকু পরিচয়ই সে পেলো ভারতের। বোট ফিরে যাচ্ছে, সেও ফিরল জাহাজে।

আরও এক হপ্তা নীল সমুদ্রের বুকে। তারপর জাহাজ ভিড়ল আর এক দেশে, এখানেও প্রচুর বর্ষণ আর সবুজের প্রচুর সমারোহ। ছোট ছোট হ'লদে মানুষ ভিড় ক'রে এল চারদিকে। প্রত্যেকের হাতে এক একটা কয়লার চুপড়ি।

"তাহলে কি চীনে এসে গেলাম?" জিজ্ঞাসা করল সিলভেস্টার। জিজ্ঞাসার হেতু এই যে লোকগুলো হ'লদেই নয় শুধু, মুখগুলো তাদের গোলগাল-চ্যাপ্টা, আর মাথায় তাদের লম্বা টিকি।

কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাবে সে শুনল যে চীন এখনও দূর আছে, এ শুধু সিঙ্গাপুর। চুপড়ি থেকে কয়লা ঢালছে জাহাজের গুদামঘরে, কালো

ধুলোয় আচ্ছন্ন চারিধার, সিলভেস্টার তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তার কাকের বাসায়।

তারপর একদিন তারা পৌঁছোলো টুরেন ব'লে একটা জায়গায়। আর সেখানে পেলো "সার্স" নামে একখানা রণতরী। নোঙর ফেলে ব'সে আছে এই সার্স, বন্দরটা অবরোধ ক'রে। সিলভেস্টার কিছুদিন থেকেই শুনে আসছে—সার্স জাহাজই হবে তার কর্মস্থান। এইবার তার তল্পি-তল্লাসমেত সে স্থানান্তরিত হ'ল সার্সে।

তার নিজের জেলার কিছু লোককে সে এখানে পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে দু'জন আইসল্যাণ্ডিয়াও রয়েছে। বর্তমানে তারা গোলন্দাজ।

এখনও দিনগুলো উষ্ণ শান্ত সুকোমল। সন্ধ্যার দিকে কারও কোন কাজ নেই। প্লাউবাজলানেকের বাসিন্দা কয়জন একত্র ব'সে আড্ডা জমায় ডেকের এক কোণে। অন্যদের থেকে তফাতে। স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় ক'রে ক্ষণস্থায়ী একটা ব্রিটানি গ'ড়ে তোলে গল্পে আর গানে।

দীর্ঘ পাঁচ মাস এইখানে আলস্যে কাটল সিলভেস্টারের। এই নিরানন্দ বন্দরে। তারপর এল বহুপ্রত্যাশিত সেই দিন, যেদিন যুদ্ধে যাওয়ার ডাক এল তার কাছে।

* * *

সার্স জাহাজ তখন হালং প্রণালীতে। এক সন্ধ্যায় ডাক নিয়ে জাহাজে উঠেছে ডাকপিওন। তাকে ঘিরে ধরেছে নাবিকেরা। যাদের চিঠি আছে, সেই ভাগ্যবানদের নাম একে একে ডেকে যাচ্ছে পিওন জোর-গলায়। একটা লণ্ঠন তার সমুখে জ্বলছে। ঠেলাঠেলি লেগে গিয়েছে সেই লণ্ঠনের কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

"মোয়াঁ, সিলভেস্টার"—ডাকল পিওন। মোয়াঁর নামে একখানা চিঠি আছে। সিলভেস্টার কোন রকমে ভিড়ে ঢুকে চিঠি হাতিয়ে আনল। পেইম্পলেরই ছাপ আছে বটে চিঠির উপরে, কিন্তু লেখা ত গোঁয়ের হাতের নয়! এর মানে কী? কার কাছ থেকে এল এ-চিঠি?

অনেকবার উলটে পা'লটে তারপর ভয়ে-ভয়ে সে খুলে ফেলল চিঠি।

"প্লাউবাজলানেক
৫ই মার্চ, ১৮৮৪।"

"কল্যাণীয় দাদুভাই……"

হাঁ, চিঠি ঠাকুরমায়েরই বটে। এইবার স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলছে সিলভেস্টার। নিজে আবার নাম সইও করেছে ঠাকুরমা এবার। অনেক কষ্টে নাম-সইটা রপ্ত করেছিল বুড়ী, কাঁপা-কাঁপা অক্ষর। পণ্ডিতি-পণ্ডিতি ধাঁচ সে-সইয়ের।

সিলভেস্টার চিঠিখানা মাথায় ঠেকা'ল, ঠোঁটে ঠেকা'ল। প্রাণের আবেগে নামটার উপরে আকুল চুম্বন মুদ্রিত করল একবার, যেন এ-নাম শুধু নাম নয়, তার রক্ষাকবচ। তার জীবনের সব-চেয়ে সঙ্গিন মুহূর্তে এ-চিঠি এসেছে তার হাতে। সবচেয়ে সঙ্গিন, কারণ কা'ল সূর্যালোক ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রণক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করতে হবে।

এপ্রিলের এখন মাঝামাঝি। বাক-নিন আর হং হোয়া সবে অধিকৃত হয়েছে। এই টংকিন অঞ্চলে বড় রকম কোন অভিযানের তোড়জোড় এখন হচ্ছে না। প্রধান কারণ অবশ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈনিকের অভাব। নতুন নতুন সৈন্য আসছে না, তা নয়। কিন্তু বড় রকমের যদি আক্রমণ চালাতে হয়, আরও হাজার পাঁচেক রংরুট তার আগে এখানে এনে ফেলা দরকার। কোথায় সেই পাঁচ হাজার?

না, বড় রকমের অভিযান নয়। তবে আকস্মিক আক্রমণ এদিকে ওদিকে চালানো হচ্ছে এবং হবে। রণতরীতে যেসব সৈন্যদল থাকে, তাদেরই একাজে নিয়োজিত করার নীতি গ্রহণ করেছেন সেনাপতিরা। নার্স থেকে কিছু সৈন্য এই কাজেই যাচ্ছে, তাদেরই একজন হ'ল সিলভেস্টার। তালিকায় ওর নাম উঠতেই বেজায় খুসী ও। বন্দর অবরোধ ক'রে আছে রণতরী, সৈনিক ব'সে আছে সেই রণতরীতে, এর চাইতে একঘেয়ে জীবন আর কিছু হয় না। দীর্ঘ পাঁচ মাস এই একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে সিলভেস্টার। এইবার তা থেকে মুক্তি। হাত-পা খেলিয়ে সে আনন্দ করতে পারবে একটু।

শান্তি স্থাপনের একটা কাণাঘুষা শোনা না যাচ্ছে, তা নয়। কিন্তু সিলভেস্টারের আশা, ও জিনিস স্থাপিত হওয়ার আগেই লড়াইয়ের স্বাদ খানিকটাও সে পাবে অন্ততঃ। সে একা নয়, এ-জাহাজ থেকে বেশ

কয়েকজনই যাচ্ছে এবারে। এরা সন্ধ্যার আগেই তল্পি গুছিয়ে নিয়েছে। যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এই পাঁচমাসে, তাদের মধ্যে অনেকেই প'ড়ে থাকছে পিছনে। সিলভেস্টারেরা বিদায় নিচ্ছে বেশ খানিকটা মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে। যুদ্ধ যে কী জিনিস, সে-সম্বন্ধে সিলভেস্টারের ধারণা খুব অস্পষ্ট। তবু একটা উত্তেজনা, একটা উদগ্র আগ্রহ পেয়ে ব'সেছে তাকে। কারণ লড়ুয়ে বংশের ছেলে ত সে! তার বাপও ছিল এই কাজের কাজী।

যা হোক, চিঠিখানা পড়তে হচ্ছে।

গৌরের কোন অমঙ্গল হয় নি ত? না যদি হয়ে থাকবে, তাহলে ঠাকুরমা অন্য লোককে দিয়ে চিঠি লেখাতে গেলেন কেন? মনে অনেকখানি অস্বস্তি নিয়ে একটা লণ্ঠনের কাছে গিয়ে বসল সিলভেস্টার। সে একা নয়, অনেকেই এসে ভিড় করেছে ঐ লণ্ঠনের কাছে। সবাই এসেছে চিঠি পড়তে। ঘরের ভিতরকার হাওয়া ভারী আর বিষাক্ত হয়ে উঠছে এত লোকের নিশ্বাসে।

এই যে! চিঠির গোড়াতেই গৌরের কথা রয়েছে। ঠাকুরমা লিখছেন—

"কল্যাণীয় দাদুভাই, তোমার দিদিকে দিয়ে আমি এ-চিঠি লেখাচ্ছি না। বেচারীর ভারী বিপদ যাচ্ছে। দুই দিন হ'ল, তার বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছে। আর, তার চেয়েও মারাত্মক কথা কী জান, তার বিষয় সম্পত্তি সে বেঁচে থাকতে থাকতেই নষ্ট ক'রে গিয়েছে। এই বছরই শীতের সময় প্যারিতে গিয়ে কীসব ফাটকাবাজিতে টাকা ঢেলেছিল সে, সব ভরাডুবি হয়েছে। ওদের বাড়ি, মায় সব আসবাব পত্র, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেশের লোক চমকে গিয়েছে এই ব্যাপারে। আমি ভয়ানক দুঃখ পেয়েছি গৌরের এই বিপদে, তুমিও দাদু অবশ্যি দুঃখ পাবে।

গেয়সদের ছেলেটা বলেছে—আমি যেন তার কথা মনে করিয়ে দিই তোমাকে। সে আরও এক বছরের জন্য কাপ্তেন গার্মিয়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হ'ল। ঐ 'মেরী' বোটেই। এবার ওরা একটু তাড়াতাড়িই আইসল্যাণ্ডের দিকে বেরিয়ে পড়ল। এই মাসের পয়লা তারিখেই গেল ওরা। গৌরের এই বিপদটা ঘটার মাত্র দুই দিন আগে। ওরা এ-খবর পায় নি এখনো।

কিন্তু দাদুভাই, ওদের দু'জনের বিয়ে হবে, এমন আশা আর বোধ হয়

নেই। ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ত বেচারী গৌরকে খেটে খেতে হবে এখন থেকে।”

সিলভেস্টারের মাথায় বাজ পড়েছে যেন। যুদ্ধে যাওয়ার আনন্দ উবে গেল তার, এই দুঃসংবাদ পেয়ে।

* * *

হাওয়ায় বাঁশী বাজিয়ে ছুটল—কী ওটা ?

কী আবার ! বুলেট একটা—

সিলভেস্টার ছুটতে ছুটতে থেমে গেল, কাণ পেতে শুনছে সে—

একটা বিশাল প্রান্তর। এত বিশাল যে তার শেষ চোখে পড়ে না। আর তেমনি সবুজ। বসন্তের সতেজ সবুজে আদিগন্ত মণ্ডিত। আকাশে মেঘ। সে-মেঘ যেন কাঁধের উপর চেপে আছে বোঝার মত।

আবার ! নিঃশব্দ হাওয়ায় আবার সেই একই শব্দ !

সশস্ত্র নাবিক ছয়জন তারা। কাদাভরা সরু পথের দুই ধারে বাড়ন্ত ধান ক্ষেত। ওরা খুঁজে দেখছে, সেই ধানক্ষেতে কোন দুশমন লুকিয়ে আছে কিনা।

সেই একই শব্দ। তীক্ষ্ণ, জোরালো একটা দীর্ঘায়িত ‘জী-ই-ই-প’ শুধু। আওয়াজ থেকেই মালুম, কী শয়তানী অস্ত্র ও আওয়াজের উৎস। অতি ক্ষিপ্র, অতি নিশ্চিত, অতি মারাত্মক। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।

এই ‘জী-ই-ই-প’ রাগিনীর সঙ্গীত জীবনে এই প্রথম শুনছে সিলভেস্টার। সেও বুলেট ছাড়ছে। কিন্তু তার বুলেট থেকে এ-গান ত বেরোয় না বন্দুকের আওয়াজটা অনেক সময়ই শোনা যায় না দূরত্বের দরুণ, কিন্তু এই বুলেটের গান ? কানের কাছ দিয়ে বিদ্যুতের বেগে বেরিয়ে যায় যে হাল্‌কা ধাতুখণ্ড সুরের তরঙ্গ তুলে, তাকে না শুনে উপায় কী ?

আবার জী-ই-ই-প ! আবার জী-ই-ই-প ! বুলেটের বৃষ্টি শুরু হ’ল। নাবিকেরা থেমে পড়েছে। তাদের পায়ের কাছেই ধানক্ষেতের নরম কাদায় পুতে যাচ্ছে বুলেট। শিলাবৃষ্টির সময় শিলার টুকরো থেকে যে একটু খুট্ ক’রে আওয়াজ বেরোয়, পড়ার সময় তার চেয়ে বেশী কিছু আওয়াজ এরা দিচ্ছে না। জলের ভিতর পড়লে ছ’লকে উঠছে খানিকটা জল শুধু, আর কিছু না। নাবিকেরা এ-ওর পানে তাকিয়ে হাসল

একবার। যেন একটা প্রহসনের অভিনয় দেখছে তারা। "চীনে হে, চীনে !"—ব'লল একজন।

আনামের বাসিন্দা, টংকিনের বাসিন্দা, যারা কালো পতাকা ওড়ায় তারা, যারা লাল ঝাণ্ডা ওড়ায় তারাও, সবাই এদের বিচারে চীনে।

'চীনে হে, চীনে'। ঐ একটা 'চীনে' শব্দের ভিতরে কত যে তাচ্ছিল্য, কত যে বিদ্রূপ আর ঘৃণা, 'আর কী অপরিসীম রণতৃষ্ণার আভাস যে একাধারে নিহিত আছে, তা ভাষায় বর্ণনা করবে কে ?

আরও গোটা তিনেক বুলেট এল, আগের চেয়ে নীচু দিয়ে ছুটছে এরা, মাটিতে প'ড়ে আবার লাফ দিল এরা ফড়িংয়ের মত, তাও দেখল নাবিকেরা। একটা মিনিটও নয়। তারপরই এই সীসক-বৃষ্টি থেমে গেল। বিশাল হরিৎ কান্তারে গভীর শান্তি বিরাজ করছে আবার। ওরা ছাড়া অন্য কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বই যেন নেই কোথাও।

নাবিকেরা এখনও দাঁড়িয়ে। চোখের নজর তীক্ষ্ণ, নাসিকা শুঁকছে বাতাসের গন্ধ। সকল ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি প্রয়োগে এরা নির্ণয় করতে চাইছে—বুলেটগুলো এল কোন্‌দিক থেকে।

অবশ্যই ঐ অদূরবর্তী বাঁশঝাড়টার আড়াল থেকে, সমতল প্রান্তরের মাঝখানে যা একগুচ্ছ পালকের মত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে উঁচু হয়ে আছে। ঝাড়ের পিছনে আবার আধেক-লুকোনো কয়েকখানা কুঁড়ের শিংওয়ালা চাল দেখা যায় যেন। নাবিকেরা দৌড়োলো ঐ ঝাড়ের দিকে, পা ডুবে যাচ্ছে, হ'ড়কে যাচ্ছে, কাদায়। সিলভেস্টারের লম্বা লম্বা পা, সে-পায়ের বেগও বেশী। কাজেই সবাইয়ের আগেই রয়েছে সে।

আর বাঁশীর সুর ভাঁজছে না কেউ। স্বপ্ন দেখল নাকি ওরা ?

চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

কতকগুলি জিনিস আছে দুনিয়ার দেশে দেশে, যাদের একই চেহারা। যেমন ধর, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ধূসর সমারোহ, বসন্তের প্রান্তরে স্নিগ্ধ সবুজ শোভা। মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে ওদের মনে হ'ল ঐ-মাঠ বুঝি ফরাসীদেশেরই মাঠ, ওরা ওখানে দৌড়োচ্ছে মনুষ্যমৃগয়ার জন্য নয়, অন্য কোন খেলার নেশায়।

কিন্তু সে-বিভ্রান্তি ঘুচতেই বা কতক্ষণ ? আর একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাঁশপাতাগুলোর বিশেষ বৈদেশিক আকৃতি, ঘরের চালের

হাস্যকর গঠনপ্রণালী, আর সব কিছু ছাপিয়ে, হ'লদে রং মানুষ কতকগুলি, এতক্ষণ যারা ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে ওদের সংখ্যা আর শক্তির একটা আন্দাজ নেবার চেষ্টা করছিল। এইবার তারা বেরিয়ে এল, এবং এগুতে লাগল, মুখ তাদের হিংসায় আর ক্রোধে বিকৃত।

তারপরই তারা ছড়িয়ে পড়ল লম্বা রেখায়, আর চীৎকার ক'রে ছুটে এল আগন্তুকদের অভিমুখে, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই।

"চীনে হে, চীনে!"—আর একবার বলল নাবিকেরা আগের মতনই মৃদু হেসে। সে-হাসি এখনও আগের মতনই বীরত্বব্যঞ্জক।

তা তারা যতই হাসুক, এটাও তারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে শত্রুরা সংখ্যায় বহু। সিলভেস্টার হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, পিছন থেকেও আর একটা দল ছুটে আসছে, ঐ ঘৃণিত চীনেদেরই। তারাও বহুল সংখ্যাতেই আসছে।

সিলভেস্টার অসীম শৌর্যসাহসের পরিচয় দিল সেদিন। তার বুড়ী ঠাকুরমা গর্ববোধ করতে পারতেন, তার সে লড়াই দেখলে।

এ-কয়েকদিনে চেহারা তার পালটে গিয়েছে। রো'দে পুড়ে সাদা মুখ তামা'টে হয়েছে তার, গলার আওয়াজ হয়েছে ভারিক্কি। আজ তাকে দেখে মনে হচ্ছে এতদিনে সে যেন নিজের যোগ্য পরিবেশ খুঁজে পেয়েছে।

দুইদিক থেকে গুলি আসছে, নিজেরা তারা ছয়জন মোটে, কিংকর্তব্য নির্ণয় করতে না পেরে, নাবিকেরা বুঝি পিছু হ'টবার কথাই চিন্তা করছিল সেই মুহূর্তে। অবশ্য হ'টে যাওয়া মানেই দাঁড়া'ত ম'রে-যাওয়া। তবু তারা হ'টতেই শুরু করত বোধ হয়।

হ'টল না শুধু সিলভেস্টার। সে এগুতেই থাকল। মুখের দিকটা ধ'রে রাইফেল উঁচিয়ে তুলল লাঠির মত, আর সেইভাবেই তেড়ে গেল। চীনেদের একটা গোটা দলকে। ডাইনে পিটোয়, বাঁয়ে পিটোয়, দেখতে দেখতে তার দোহাত্তা ঘায়ে বেশ কয়েকটা দুশমন ধরাশায়ী হ'ল। তার সঙ্গীরাও সাহস সঞ্চয় করেছে তার দৃষ্টান্ত দেখে, তারাও ছুটে এসেছে দাঙ্গার অংশ নিতে, পাশা উলটে গেল তাদের সমবেত চেষ্টায়। ভয়টা, সেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাবটা, সব পরাজয়ের অগ্রদূত যা, তা এখন ভর করেছে চীনেদের ঘাড়ে, তারা পালাতে লাগল।

পালাচ্ছে তারা। ছয়টা নাবিক ফুরসুৎ পেয়ে বন্দুকে গুলি ভরেছে

আবার। চীনেরা মাটি নিচ্ছে বুলেটবৃষ্টিতে। ঘাসের ভিতরে ভিতরে রক্ত জমে যাচ্ছে এক এক জায়গায়। ধানক্ষেতের ভিতর গিয়ে আছড়ে পড়েছে যারা, তাদের বিচূর্ণ মাথা থেকে ঘিলু বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে ক্ষেতের কাদাজলে।

পালাচ্ছে তারা, কুঁজো হতে হতে, প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে চার হাত-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, চিতাবাঘের মতই একরকম। সিলভেস্টার তাড়া করে যাচ্ছে তাদের, যদিও দুই দুইবার সে জখম হয়েছে ইতিমধ্যে, উরুতে একটা বল্লমের ঘা, বাহুতে একটা গভীর কোপ। দুই দু'টো জখম নিয়েও সে তেড়ে যাচ্ছে, যুদ্ধের নেশা ছাড়া অন্য কোন অনুভূতিই তার নেই এখন, যে-নেশার মূল হল রক্তের তেজ। এই তেজের দরুণই সাধারণ মানুষ হয় সাহসী, আর এই তেজের আধিক্যবশতঃই প্রাচীনকালের যোদ্ধারা মহাবীর হত এক একজনে।

যাদের তাড়া করে যাচ্ছিল সিলভেস্টার, তাদেরই একজন—

লোকটা দেখল এমনিও মরেছি অমনিও মরেছি। মরিয়া হয়ে সে ফিরে দাঁড়াল। সিলভেস্টার হাসল একটু। ক্ষুদ্রের প্রতিরোধ দেখে মহৎ যে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, সেই হাসিই হাসল সিলভেস্টার। চীনেটা গুলি যা করে, করে নিক। ওর তাক কোন্ দিকে সেইটে শুধু সিলভেস্টার দেখে নিল, তারপর একটুখানি বাঁয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ভবিতব্য—

ঘোড়া যখন টিপতে যাচ্ছে চীনেটা, রাইফেলের নল একচুল নড়ে গেল। সরে গেল সেই দিকেই। একান্ত দৈবাৎ। সিলভেস্টারের মনে হল তার বুকে একটা কী তোলপাড় হয়ে গেল যেন। কী যে হয়েছে, তা পলকে বুঝে নিল সে।- যদিও তখন পর্যন্ত একটু ব্যথা সে অনুভব করে নি, পিছনের নাবিকদের সম্বোধন করে প্রাচীনকালের সেই মামুলি বুলি সে আওড়াল—"টিকিট কেটে ফেলেছি—হে !"

এতক্ষণ সে দৌড়োচ্ছিল, শ্বাস নিচ্ছিল গভীর, যাতে বাতাসে ভরপুর থাকে ফুসফুস। এইবার যেন তার মনে হল—বাতাস শুধু নাক দিয়ে নয়, ঢুকছে বুকের ডান পাশের একটা ফুটো দিয়েও। কী আওয়াজই করছে ঢোকার সময়! হাপরের আওয়াজের মত। মুখের ভিতরটা হঠাৎ রক্তে ভরে গেল, আর পাঁজরার কোলে একটা তীব্র বেদনাও উঠল চিড়িক দিয়ে।

সে-বেদনা চটপট বেড়ে চলল, খুবই চটপট, অসহ্য হয়ে উঠল দেখতে দেখতে, অকথ্য, বর্ণনাতীত।

দু'বার তিনবার ঘুরপাক খেলো সে, মাথাটা বনবন করে ঘুরছে তার। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসছে গলা দিয়ে, দম আটকে দেয় সেই রক্ত। দম নেবার জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে ঘাড়-মুড় ভেঙে সে কাদার ভিতর শুয়ে পড়ল।

*　　　*　　　*

পনেরো দিন কেটেছে তার পর। বর্ষা এসে পড়েছে। আকাশ সদাই কালো এখন। হলদে মানুষের দেশ টংকিনের উপর গ্রীষ্মের তাপ চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত।

সিলভেস্টারকে নিয়ে আসা হয়েছিল হ্যানয় শহরে। সেখান থেকে হালং উপসাগরে পাঠানো হল তাকে। একটা হাসপাতাল জাহাজ কঠিন রোগীদের নিয়ে হালং থেকে ফ্রান্স যাত্রা করবে, সিলভেস্টারকেও তোলা হল সেই জাহাজে।

এ্যাম্বুল্যান্স থেকে এ্যাম্বুল্যান্স, এক স্ট্রেচার থেকে অন্য স্ট্রেচার, এই ভাবে অনেকদিন ধরে সাথীরা বয়ে নিয়ে এসেছে ওকে। যা কিছু করা সম্ভব, সিলভেস্টারের জন্য করেছে সামরিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গোড়ায় ত এ-যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়নি! বুকে জল ভরে উঠেছে ওর, আহত দিকটায়। বাতাস এখনও ঢোকে সেই ফুটো দিয়ে, সে-ফুটো বন্ধ করতে পারেনি ডাক্তারেরা। বাতাস ঢোকে, ভিতরের জলে ভুড়ভুড় শব্দ তোলে সে বাতাস।

বীরত্বের জন্য মিলিটারি মেডাল দেওয়া হয়েছে তাকে, এক মুহূর্তের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখ, সেই মেডাল পেয়ে।

কিন্তু আগের সে সিলভেস্টার আর নেই ও। চালচলনে ক্ষিপ্র, কথাবার্তায় সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সেই তরুণ সৈনিকসত্তাটি হারিয়ে গিয়েছে ওর ভিতর থেকে।

দীর্ঘদিনের রোগযন্ত্রণা, রোগজনিত দুর্বলতা জীবনশক্তিটাই নিংড়ে বার করে দিয়েছে সিলভেস্টারের। এখন সে প্রায় শিশুর মত, বাড়ির জন্য পাগল। কথা বলে কদাচিৎ, প্রশ্নের জবাব দেয় যে-স্বরে, তা শব্দহীন বললেই ঠিক হয়। এমন অসুখ, অথচ সেই অসুখের সময় সে এত-এত-

এত দূরে! বাড়ি থেকে এত দূরে! ঠাকুরমার স্নেহাঞ্চলের আশ্রয় থেকে এত দূরে! বাড়ি পৌঁছতে আরও কত-কত-দীর্ঘ দিন লেগে যাবে, তা ভাবতে গেলেই তার ভয় হয়। ততদিন কি বাঁচবে ও? দেহের সব শক্তিই যখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে?

এই ভয়াবহ দূরত্বের চিন্তাই চেপে বসে আছে তার মগজে সারাক্ষণ। দুই এক ঘণ্টার বেশী ঘুম হয় না, আর সে ঘুম ভেঙে যায় ঐ জখমের যন্ত্রণায়। আর তক্ষুণি জখমের যন্ত্রণার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দেয় ঐ সর্বগ্রাসী চিন্তা—"পারব কি বাড়ি পৌঁছতে? পারব কি?" সকালবেলা রোজই জ্বর আসে তার, প্রলাপের ঘোরে বাড়ির কথাই কপচায় শুধু, বাড়ির আর ঠাকুরমার কথা।

হাসপাতাল জাহাজে ছোট ছোট লোহার খাটিয়া, তারই একটাতে ওর বিছানা হল। আবার শুরু হল সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা, এবারে উলটোমুখে। আগের বারে ওর আস্তানা ছিল হাওয়ার রাজ্যে, কাকের বাসায়। এবারে আটো সাটো খোলের ভিতর, হাওয়া যেখানে নামমাত্র, গরম যেখানে অসহ্য। একটা মাত্র গবাক্ষ যা আছে, তাও ঢেউয়ের জল যাতে ঢুকতে না পারে, সেইজন্য শক্ত করে এঁটে দেওয়া।

উঃ, কী অসহ্য এই ওষুধের গন্ধ, ঘায়ের গন্ধ, নানা জনের নানা রোগের নানারকম গন্ধ!

বাড়ি যাচ্ছি এই আনন্দে প্রথম কয়েকটা দিন ওকে একটু চাঙ্গা দেখাচ্ছিল। বালিশে ভর দিয়ে সে উঠে বসেছে তখন, ওর বাক্সটা চেয়ে নিয়েছে নার্সদের কাছ থেকে। হালকা কাঠের বাক্স একটা, পেইম্পল থেকে কেনা, এতেই ওর সব কিছু ও রাখে। ঠাকুরমার চিঠিগুলি এতে আছে। ইয়ানের চিঠিও, গৌরের চিঠিও। তা ছাড়া একখানা লাইনটানা খাতা, তাতে সে লিখে রেখেছে দুই চারটা গান, যে-গান সচরাচর নাবিকেরা গেয়ে থাকে। আরও আছে একটা জিনিস। লুঠের মাল একটা। চীনাভাষায় কনফিউশিয়াসের কেতাব একখানা। বইখানিতে সাদা পাতা আছে মাঝে মাঝে, সেই সব পাতায় ও মাঝে মাঝে টুকে রেখেছে ওর অভিযানের অনাড়ম্বর দিনপঞ্জী।

হ্যাঁ, কয়েকটা দিন ও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, তারপরই কিন্তু ও

আবার নেতিয়ে পড়ল। এবার ভয় পেলেন ডাক্তারেরা, তবে কি ছেলেটা ভাল হয়ে উঠবে না?

বিষুবরেখার কাছাকাছি এল জাহাজ। কী গরম! ঝড়ের সময় এটা, নিত্যই লেগে আছে ওটা। জাহাজ দ্রুত চলেছে, রোগীদের খাটিয়ে নড়ে নড়ে উঠছে, খাটিয়ার সঙ্গে আহত রুগ্ন সৈনিকরাও। আন্দোলিত, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জাহাজ দ্রুত চলেছে রোগীদের দেশে পৌঁছোবার জন্য। কিন্তু কয়-জনকে পারবে পৌঁছোতে? হালং থেকে বেরুবার পর ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সমুদ্রগর্ভে। লোহার খাটিয়া ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গিয়েছে কয়েকখানা।

সিলভেস্টারের অবস্থাও খারাপ। বুকের জখমটা দুই হাতে চেপে ধরে ও শুয়ে আছে। যাতে ভিতরের জলগুলো নড়ে বেড়াতে না পারে। ডান ফুসফুস পচেই গিয়েছে, বাঁয়েরটাও সুস্থ নেই, চরম যন্ত্রণা শুরু হল এবার।

মস্তিষ্ক তার ক্লিষ্ট, অর্ধমৃত। তাতেই নানা ছবি ফুটে উঠছে তার স্বদেশের। গুমোট অন্ধকারের ভিতর কাদের সব মুখ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন তার মুখের উপরে। কোন মুখ প্রিয়জনের, কোন মুখ আবার এমন এমন লোকেরও, যাদের ও পছন্দ করেনি কোনদিন। কী যেন বিভ্রমের ঘোরে সময় কাটছে তার। এই যেন সে ব্রিটানিতে, তার পরই যেন আইসল্যাণ্ডে। এই যেন আইসল্যাণ্ডে, তার পরই আবার টংকিনে—

সকাল বেলায় সে পাদরিকে ডেকে পাঠাল। তিনি এসে যথাকর্তব্য সবকিছু করলেন। ওর কথা সবই শুনলেন। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। লড়ুয়ে নাবিকের দেহ মন যে এমন শুচি হতে পারে, তা তিনি আগে জানতেন না।

"হাওয়া! হাওয়া! বাইরের মুক্ত হাওয়া দমভোর নিতে দাও আমায়" চেঁচিয়ে বলতে চায় মৃত্যুপথযাত্রী। অভাগা যুবক! চেঁচাবার সামর্থ্য তার নেই। চেঁচালেও তার সে অনুরোধ রক্ষা সম্ভব হত না। একটা গবাক্ষ ওরা খুলে দিল সিলভেস্টারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। তাতেও বিপদ, সমুদ্র উত্তাল, ঢেউয়ের জল এসে ঢুকছে ভিতরে।

তা আসুক জল, সেই সঙ্গে এল অস্তসূর্যের এক ঝলক আলোও।

কী টকটকে লাল আলো! দিগন্তের রাজপাটে সূর্যদেব বসেছেন রাজকীয় সমারোহে। আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন বটে, কিন্তু ঐখানটাতেই

সসম্ভ্রমে সরে গিয়েছে তারা ডাইনে বাঁয়ে, দিনপতির আলোকদূতকে রাস্তা করে দেওয়ার জন্য। জাহাজ দুলছে, চোখ-ধাঁধানো সেই লাল আলোটাও দুলে দুলে উদ্ভাসিত করে তুলছে, কখনো এধার, কখনো ওধার সিলভেস্টারের মৃত্যুশয্যার।

শেষ মুহূর্তের একটা দৃষ্টিবিভ্রম বড়ই যাতনা দিল অভাগাকে। সে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, সেই রাস্তায় অতি দ্রুতপদে হেঁটে চলেছেন তার বুড়ী ঠাকুরমা, মুখে তাঁর মর্মান্তিক দুশ্চিন্তার ছাপ। আকাশে কালো কালো মেঘ, তা থেকে ঝর ঝর বাদল ঝরছে বৃদ্ধার গায়ে মাথায়। তিনি যাচ্ছেন পেইম্পল, সেখান থেকে নৌবিভাগের অধিকর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে। ডেকে পাঠিয়েছেন কেন, তাও যেন বুঝতে পারছে সিলভেস্টার। একটা খবর বুড়ীকে দিতে চান কর্তা। সে-খবর হল এই যে মরে গিয়েছে তাঁর নাতিটা।

মৃত্যুযাতনায় ছটফট করছে সিলভেস্টার। মাঝে মাঝে পচা জলের সঙ্গে মেশানো রক্ত বেরুচ্ছে তার মুখ থেকে, নার্স তা মুছে নিচ্ছে তোয়ালে দিয়ে। সূর্য ওদিকে জ্বলজ্বল করছে তখনো। খোলা জানালা দিয়ে একটা আলোর ঝলক এসে পড়েছে তার বিছানায়, রচনা করেছে একটা জ্যোতি-র্মণ্ডল যেন তাকে ঘিরে।

এই সূর্যই এই মুহূর্তে বহুদূরের ব্রিটানিতেও বিতরণ করছে তার আলো, সেখানে এখন দুপুর বাজতে যাচ্ছে। খড়ে-ছাওয়া পাথরের ঘরের দোরগোড়ায় বসে বুড়ী ইভোন মোয়াঁ সেলাই করে চলেছে আপন মনে। মধ্য গগনের নীলিমাকে পশ্চাৎপটে রেখে এই সূর্যই পাঠিয়ে দিচ্ছে আলোর লহর বুড়ো মানুষটাকে গরমে রাখবার জন্য।

আইসল্যাণ্ডেও এই মুহূর্তে এই সূর্যই ইয়ানের মাথায় মুখে মাখিয়ে দিয়েছে এক বিষণ্ণ গোধূলির আলো। মাছ ধরছে ইয়ান 'মেরির' ছাদে—বসে, পাহাড়-ঘেরা এক ফিয়র্ডের নিরিবিলি নীল জলে।

এই সূর্য অবশেষে ডুবল এক সময় বিষুবরেখার পাশের সমুদ্রে। ডুবল যখন, জানালা দিয়ে যে আলোকপ্রপাত এসে দীপ্তরঞ্জিত করে তুলেছিল সিলভেস্টারের মৃত্যুশয্যা, তা একেবারে নিবে গেল যখন, সিলভেস্টারের চোখও তখন নিমীলিত হয়ে এল। তার আগে একবার পিটপিট করে সে-চোখ চেয়েছিল যেন। তারপর একবার কপালের

দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলও যেন। নার্স এইবার সেই চোখের উপর টেনে দিল চোখের পাতা। সিলভেস্টার এখন সব যাতনার ওপারে। কী শান্ত, সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! যেন শয্যালীন মর্মর মূর্তি একখানি—

* * *

চীনসমুদ্রে অনেক নাবিকের দেহকেই বিসর্জন দিয়ে এসেছে এই জাহাজ। কিন্তু সিলভেস্টারকে সলিলসমাধি দিতে ইচ্ছা হল না কাপ্তেনের। এর কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে সিঙ্গাপুর দ্বীপটা অতি কাছে এসে পড়েছে। আর ঐ সিঙ্গাপুরে ত একবার নোঙ্গর ফেলতেই হবে জাহাজকে!

সেই অবসরে কেন গির্জার পবিত্র ভূমিতে এই নিষ্পাপ দেহটার চির-বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হোক না!

খুব ভোরেই শবযাত্রা বেরুলো জাহাজঘাটা থেকে। বেলা বাড়লেই রৌদ্র বাড়বে, অসহ্য হবে তার তেজ। একখানা লঞ্চ কূলে পৌঁছে দিয়েছে দেহটি, ফরাসীদেশের জাতীয় পতাকায় তা আবৃত। শহরটা তখনও ঘুমে অচেতন। কন্সল একখানা ছোট গাড়ি পাঠিয়েছেন, তাইতে তোলা হল দেহ। কাঠের একখণ্ড ক্রুশও। এটি জাহাজের ছুতোর দিয়েছে তৈরি করে। কাঠের উপর রং এখনো শুকোয় নি।

বহুভাষাভাষী এই আধুনিক ব্যাবেলের ভিতর দিয়ে চলে গেল শবযাত্রা। চীনা মহল্লার নিকটেই ফরাসী গির্জা একটি, সেখানে যাজক মহাশয় উপস্থিতই আছেন। তিনি সময়োচিত মন্ত্রপাঠ, স্তোত্রগান সবই করলেন। সেখান থেকে বেশ একটু দূরে সমাধিস্থান। কফিন তখনও জাতীয় পতাকায় ঢাকা। আবার এক চীনা মহল্লা। তারপর ভারতীয়দের একটা পাড়া। কত জাতির এশিয়াবাসী যে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল ফরাসী নাবিকদের মৌন মিছিল!

অবশেষে ওরা পৌঁছে গেল। গ্রাম্য পরিবেশ, ছায়াচ্ছন্ন রাজপথ, নীল ভেলভেটের মত ডানা মেলে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায় রোদ্দুরে। কত ফুল! কত পাম গাছ! পাতার কী বাহার সে সব গাছে! যেখানে ওরা কবর দিল সিলভেস্টারকে, সে যেন কোন ফুলবাগানেরই একটি নিভৃত কোণ।

কবরের উপরে ওরা বসিয়ে দিল সেই তড়িঘড়ি-তৈরী-করা কাঠের ক্রুশ তাতে কালো কালো হরফে লেখা—শুধু এই কয়টি কথা—

"সিলভেস্টার মোয়াঁ।
বয়স উনিশ বৎসর।"

৮

জুন মাসের গোড়ার দিকেই—

এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বুড়ী ইভোন মোয়াঁ বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছেন, পড়শীরা বললে নৌবাহিনীর আফিস থেকে লোক এসেছিল তাঁর খোঁজে। তাঁকে দেখা করতে হবে আফিসের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে।

অবশ্যই তাঁর নাতি-সংক্রান্ত ব্যাপার কিছু। ওতে ভাববার কিছু নেই। নাবিকদের বাড়িতে এরকম তলব আসে হামেশাই। কাজ থাকে কোন-না-কোন রকম। ইভোন মোয়াঁ নাবিকের মেয়ে, নাবিকের স্ত্রী, নাবিকের মা, এবং শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমাও হয়েছেন নাবিকের। এ আফিসের সঙ্গে তাঁর কারবার আজ ষাট বৎসরের।

কিছু ভাতার ব্যাপার হবে বোধ হয়। সার্স জাহাজের তরফে আফিস তাঁকে কিছু পয়সাকড়ি দেবে বলে মনে হয়। নিজের পরিচয়-কার্ডখানা বার করে নিয়ে একটু সাজগোজ করে নিলেন ইভোন ঠাকরুন, বড়-কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে ত! সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরে, নতুন টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বেলা ঠিক দুটোর সময় রওনা হলেন ইভোন।

পাহাড়ের মাথায় মাথায় রাস্তা, ধীরকদমে ছাড়া চলা নিরাপদ নয়। তবু ইভোনের গতি আজ যথাসম্ভব দ্রুত। পেইম্পল এসে গেল। এই সময়ই হঠাৎ বুড়ীর খেয়াল হল যে আজ দুই মাসের মধ্যে কোন চিঠি তিনি পান নি সিলভেস্টারের।

জুনের হাসিমাখা আবহাওয়ায় মন আপনা থেকেই খুশী হয়ে ওঠে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এখনও চিরহরিৎ কার্জ ছাড়া অন্য কোন গাছ-গাছড়া

গজায় নি, কিন্তু উপত্যকায় নেমে আসতেই ফুলন্ত তরুলতা আর সুগন্ধি নতুন ঘাসের দেখা মিলছে যেখানে সেখানে। অবশ্য ওসব দেখবার চোখ আর ইভোন বুড়ীর নেই এখন, বয়সের ভারে সৌন্দর্য উপভোগ করার শক্তিই উবে গিয়েছে তাঁর নজর থেকে।

পল্লীতে পল্লীতে পর্ণকুটির, কালো কালো পাথুরে দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে এক এক জায়গায়। কিন্তু তাদেরই পাশে গোলাপ ফুটেছে বেড়ার গায়ে, কার্ণেশনের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ছোট ছোট আঙ্গিনা। এমন কি, চালের খড় থেকেও মাথা তুলেছে শত শত নানা রঙের ছোট ছোট ফুল, আঁধার রাতের জোনাকি ঝাঁকের মত।

বসন্ত, কিন্তু আনন্দহীন বসন্ত। প্রতি কুঁড়ের দোরে একটি করে নারী। তার চোখ হাতের কাছের জিনিস একটাও দেখছে না, দৃষ্টি তার দূরদিগন্তে নিবদ্ধ। ঐ দিগন্তের আড়ালে কোথায় আছে মেরু সমুদ্র, তার অস্থির জলে প্রাণ হাতে করে করে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে এই সব নারীদেরই পতি বা পুত্র বা ভ্রাতা। এরা যেন সেই সমুদ্রই দেখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে চর্মচক্ষুর সাহায্যে। গৃহাঙ্গনের বসন্ত কোন্ সাড়া জাগাবে এদের প্রাণে?

তবু এটা বসন্ত কাল, গুনগুনিয়ে উড়ছে ভ্রমর, ফুলে ফুলে মধুর সম্ভার, আকাশ নীল, বাতাসে উন্মাদনা—

বুড়ী ইভোন মোয়াঁ চলেছেন ক্ষিপ্রপদে—

চলেছেন সেই ঘটনার কথাটিই শুনবার জন্য, যা সুদূর চীন সাগরে ঘটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তাঁর এই করুণ পদযাত্রাই সিলভেস্টার দেখতে পেয়েছিল বিকারের ঘোরে, তার অন্তিম মুহূর্তে, তার শেষ অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছিল এই অভাগী যাত্রিনীরই অপার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। নৌবাহিনীর আফিস বুড়ী ঠাকুরমাকে ডেকে পাঠিয়েছে এই খবরটি শোনাবার জন্য যে তার নাতিটা মারা গিয়েছে লড়াইয়ে। মারা গিয়েছে নিজের দেশ-গাঁ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের অজানা সমুদ্রে, নিতান্ত অনাত্মীয়দের মাঝে।

হ্যাঁ, সিলভেস্টার দেখেছিল ঠাকুরমার এই পথ-চলা। এই পথটাই সে দেখেছিল, এই দ্রুত গতিটাই সে দেখেছিল বুড়ীর, তাঁর গায়ের বাদামী শাল, তাঁর মাথায় কানঢাকা টুপি, তাঁর হাতের ছাতা, সব সে দেখেছিল দিব্যদৃষ্টিতে, শেষ নিশ্বাস পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে।

এই দৃশ্যই অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়েছিল তাকে মরার সময়. বুড়ী ঠাকুরমার এই নিঃসঙ্গ ক্ষিপ্রগতি।

একটা মাত্র তফাত ঘটেছে। সিলভেস্টার দেখেছিল—মেঘলা আকাশ নিষ্করুণ ধারায় বারিবর্ষণ করে যাচ্ছে বুড়ীর মাথায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আজ ঘটছে ঠিক তার উলটো, রৌদ্রদীপ্ত আকাশ যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হাসাহাসি করছে বুড়ীর দুর্ভাগ্য দেখে।

পেইম্পলের রাস্তায় চলেছেন বৃদ্ধা। গ্রানাইটের বাড়িগুলির জানালায় জানালায় তাঁর পরিচিতা বুড়ীরা বসে আছেন অনেকে। তাঁরা ডাকবার সময় পেলেন না ওঁকে, মনে মনে বললেন শুধু—"অত তাড়াতাড়ি ও যায় কোথায়? আর এত ভাল কাপড়-জামাই বা আজ পরেছে কেন? রবিবার ত নয় আজ!"

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আফিসে নেই এখন, আছে এক কেরানী। এর বয়স বড় বেশী হয়ত পনেরো বছর, অতি কদাকার চেহারা, বিকলাঙ্গ বামন। মাছ ধরার কাজ এর দ্বারা কোনদিনই হতে পারবে না বুঝতে পেরে অভিভাবকেরা একে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়েছেন। যেটুকু শিখেছে, তারই দৌলতে আজও এই আফিসের কেরানী। কারণ বিদ্যার্জনের মত তুচ্ছ ব্যাপারে সময়ের অপব্যয় করেছে, এমন মূর্খ ত ব্রিটানিতে বেশী পাওয়া যায় না!

বুড়ী গিয়ে পরিচয় দিলেন নিজের। বামন উঠে গিয়ে এক খুপরি থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বার করল। কী গ্রামভারী চাল ওর!

অনেক কাগজ! অনেক! সার্টিফিকেট অনেকগুলো, তাতে শীল-মারা মাইনের খাতা একখানা, হলদে হয়ে গিয়েছে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায়, আরও সব কী-কী কাগজ। মানে কী এ-সবের? কেমন যেন মরা-মরা গন্ধ এই কাগজগুলোতে!

বামন মেলে ধরছে কাগজগুলো, বুড়ীর যেন কাঁপুনি আসছে হাড়ের ভিতর থেকে। কারণ আছে কাঁপুনির। কাগজের গাদায় দু'খানা চিঠি তিনি চিনতে পেরেছেন। দু'টোই গৌরকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছিলেন সিলভেস্টারকে, চিঠি খোলা হয় নি, যেমন গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এসেছে।

এই ব্যাপারই আর একবার ঘটে গিয়েছে ইভোনের জীবনে। বিশ-

বৎসর আগে। যখন তাঁর ছেলে পিয়ের মারা গেল। তারও নামের চিঠি এমনি না-খোলা অবস্থায় ফেরত এসেছিল চীন থেকে। এই আফিস থেকেই সেগুলি ইভোনকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

বামন এবার গ্রামভারী সুরে পড়ে শোনাচ্ছে—"মোয়ঁা, জাঁ—মেরি সিলভেস্টার, পেইম্পলে বহাল হয়। ফোলিও ২১৩, রেজিস্ট্রি নম্বর ২০৯১, বিয়েন হোয়া জাহাজে গতাসু, তারিখ ১৪ই—"

"কী? কী বললেন মশাই?"

"গ-তাসু। সে গতাসু"—জবাব দিল বামন।

না, এই বামন কেরানী জেনে শুনে নিষ্ঠুরতা করছে, এমন কথা কেউ বলবে না। সে যে এইরকম ন্যাড়া বয়ানে নাতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়ে দিল বুড়ী ঠাকুরমাকে, সে শুধু তার বুদ্ধির অভাব বশতঃই। বিকলাঙ্গ, মস্তিষ্কও অপরিণত তার। যা হোক, সে এটুকু বুঝল যে "গতাসু" শব্দটার অর্থ এই বুড়ীর বোধগম্য হয় নি। তখন সে ব্রিটন ভাষায় আওড়াল "ম্যরু ইও"—("মরে গেছে")।

ম্যরু ইও? ইভোন যন্ত্রচালিতের মত কথাটা আওড়ালেন তারই সঙ্গে সঙ্গে, হাড়ের কাঁপুনি এইবার গলার স্বরেও সংক্রামিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ থেকেই এইরকম একটা আন্দাজ তিনি করে আসছেন, কাঁপুনিটার হেতু সেই আন্দাজই। তবে আন্দাজ যখন খাঁটি সত্য বলে প্রমাণ হল, বাহ্যতঃ এই বৃদ্ধা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন একেবারে, নিথর নিস্পন্দ। কিছুদিন থেকেই কষ্টের অনুভূতি তাঁর ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, বার্ধক্যবশতঃই বোধ হয়; তবে তা খুব বেশী প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার শীতকাল থেকেই। নতুন কোন দুঃখের কারণ ঘটলে হঠাৎই তিনি আর তাতে সাড়া দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদটা শোনা মাত্রই তাঁর মস্তিষ্কে যেন কী একটা জিনিস ওলোট পালট হয়ে গেল হঠাৎ। মৃত্যু কথাটা কানে গিয়েছে বটে। কিন্তু কার যে মৃত্যু, সেটা ঠিক ধরতে পারেন নি। মৃত্যু তাঁর পুত্র পিয়েরের? না, তাঁর স্বামী গিলেউমের? তাদের মৃত্যুসংবাদও ত এই রকমই পরিবেশে আর পরিস্থিতিতে শুনতে হয়েছে এই বুড়ীকে! একবার বিশ বছর আগে। আর একবার চল্লিশ বছর আগে। তা ছাড়া আরও আরও ছেলেরা, পিয়েরই তাঁর একমাত্র পুত্র ছিল না। কে যে কবে

কীভাবে মরে গেল সবই শুনেছিলেন, কিন্তু গুলিয়ে গিয়েছে! গুলিয়ে গিয়েছে! তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে সব! এত-এত মরণের হিসেব রাখা কি সোজা?

তবে একসময় এটা তাঁর মাথায় ঢুকল যে এমনধারা খবর আর তাঁকে শুনতে হবে না কোনদিন। এইবারই শেষ, তাঁর বংশের শেষ বাতিটি আজ নিবল কালের ফুৎকারে। মোয়াঁরা নির্বংশ হল এতদিনে।

সবাইকে হারিয়ে, সব কিছু খুইয়ে, এই শেষ প্রাণকণাটুকুর উপরে এই বালক সিলভেস্টারের উপরে হৃদয়ের সব সুধারস নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন ইভোন। সব আশার সমাপ্তি হল আজ! সব কল্পনা ঝাপসা হয়ে এল। বার্ধক্য পর্যবসিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় শৈশবে।

তবে এখনও জ্ঞানগম্য একেবারে হারান নি ইভোন। এই অর্ধ মানব কেরানীটার সমুখে কাতরতা প্রকাশ করতে মর্যাদায় বাধল তাঁর। এটা কি মানুষ? এটুকু জ্ঞানও এর নেই যে ঠাকুরমার কাছে নাতির অপমৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করার রীতি এটা নয়? যতক্ষণ রইলেন ওর আফিসে, ইভোন সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন ডেস্কের সামনে, শক্ত হয়ে, হাতে হাত শক্ত করে জড়িয়ে।

কাগজপত্র সব ইভোনকে দিয়ে দিল বামন। সিলভেস্টারের মিলিটারি মেডাল, আর নগদ ত্রিশ ফ্রাঁ। এ-অর্থটা পাওয়া গিয়েছিল সিলভেস্টারের নিজস্ব সব জিনিসপত্র নীলামে বিক্রি করে। তার শার্ট, তার প্যাণ্ট, তার টুপি, মায় তার ব্যাগ বাক্স সব। নীলাম হয়েছিল বিয়েন-হোয়া জাহাজের উপরেই, কিনেছিল তারই সাথী সঙ্গীরা।

জিনিসগুলো হাতে নিয়ে, কী করবেন সেগুলি, তা যেন বুড়ী ভেবেই পান না। পকেটে রাখা? সেকথা মনে হল রাস্তায় বেরিয়ে।

এবার পথ চলার সময় বুড়ীকে কুঁজো দেখাচ্ছে একটু। পড়ে যাবে না কি বুড়ী? কানের ভিতর টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে, রক্ত এসে দড়াম্ করে করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে বুকের ভিতর। নিজেকে তবু চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বুড়ী, যেতে ত হবেই! বাড়ি ত যেতে হবেই! স্বামীপুত্র পৌত্র কেউ নেই। তবু বাড়ি ত আছে! তার ভিতর মাথাটা ত গুঁজতে হবেই! দেহ চলছে না! তবু চালাতে তাকে হবেই। চালাতে গিয়ে কলকবজা ভেঙে রাস্তায় যদি বিকল হয়ে যায় ত ভালই হয়।

আদ্ধেক পথ পেরিয়ে যাওয়ার আগেই পিঠের কুঁজটা প্রায় ধনুকের আকার নিয়েছে। পায়ের জুতো বারে বারে ঠোকর খাচ্ছে পথের পাথরে। আর এক একটা ঠোকরের ফলে মাথার ঘিলু পর্যন্ত ছলকে উঠছে যেন। তবু চলেছেন তিনি, যেতেই হবে ঘর পর্যন্ত। পথে পড়ে গেলে লজ্জা ত বটেই, কে আবার তুলবে এসে ? এ পথে লোক ত কমই চলে।

টলছে বুড়ী। টলছে! হোঁচট খাচ্ছে বারবার। গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা তা দেখে চেঁচাচ্ছে 'মোয়াঁ বুড়ী মাতাল হয়েছে ছাখ, মোয়াঁ বুড়ী মাতাল হয়েছে !"

বাড়ি পৌঁছেই ইভোন দরোজা বন্ধ করে দিলেন। মাথার টুপি চোখের উপরে পড়েছে এসে। খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন নতুন টুপিটা। রবিবারের শখের পোশাকে কাদামাটি লেগেছে পথে আসতে, ভ্রূক্ষেপও করলেন না ইভোন। সেই পোশাক পরেই নেতিয়ে পড়লেন মেজেতে, মাথাটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। হলদে-সাদা এক গোছা চুল গালের উপর দিয়ে বেয়ে এসে গলায় পড়েছে—কী করুণ !

এই অবস্থায় তাঁকে এসে আবিষ্কার করল গৌর।

এর-ওর-তার মুখ থেকে সিলভেস্টারের খবরটা সে শুনেছে। শুনেই ছুটে এসেছে বুড়ীকে দেখবার জন্য। দেয়ালে মাথা দিয়ে পড়ে আছে বুড়ী, দু'খানা হাত নিঃসাড়ের মত পাশে ঝুলছে। মুখে একটা হি-হি-হি-কাতরানি, বাচ্চা শিশুর কান্না-ভরা নালিশের মতন। চোখের জল ? না, তা নেই। অতিরিক্ত বুড়ো যারা হয়, শোকে তাপে ঝাঁজরা হয়ে যায় যারা, তাদের চোখে শেষ পর্যন্ত জল থাকে না আর।

ইভোন সব কিছু গৌরের সামনে ফেলে দিলেন—চিঠি, মেডাল, মুদ্রা-গুলো, সব। গৌর একবার সব কিছুর উপরে চোখ বুলিয়ে নিল, তার পরে সেই খানেই নতজানু হয়ে বসল প্রার্থনা করতে।

সেইখানেই তারা বসে রইল দুটি নারী, প্রায় নীরবেই। যতক্ষণ জুন মাসের দীর্ঘ গোধূলি সন্ধ্যার আঁধারে বিলীন হয়ে না গেল, বসে রইল ততক্ষণই। তারপর গৌর বলল—"আমি এসে তোমার কাছে থাকব ঠাকুরমা। আমার বিছানাটা নিয়ে আসি গিয়ে, তোমায় একা থাকতে হবে না—"

সিলভেস্টারের জন্য কেঁদেছে সে, কিন্তু কাঁদতে গিয়েই একটা বিষম

ভয়ে কান্নার উৎস শুকিয়ে গিয়েছে তার। আর এক জন—আর একজন সেও ত সমুদ্রে গিয়েছে। সে ফিরবে ত সমুদ্র থেকে? ইয়ান তাকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু সে নিজে ত নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছে সেই ইয়ানেরই কাছে! নিক বা না নিক, ইয়ান ছাড়া গৌরেরও ত আর কেউ নেই!

ইয়ান সমুদ্রে গিয়েছে মাছ ধরতে। সেখানেও মৃত্যুফাঁদ লহরে লহরে পাতা আছে। খবরটা দিতে হবে ইয়ানকে। এই খবর যে তার বন্ধু-সিলভেস্টার আর নেই। সে হয় ত কাঁদবে। কারণ সে ভালবাসত ওকে।

হঠাৎ একটু সান্ত্বনা পেল গৌর এই চিন্তা থেকেই। গৌর আর ইয়ান, যে-যার পদ্ধতিতে ভালবেসেছিল সিলভেস্টারকে, এইটাই ত এই দুইজনের ভিতরে একটা বন্ধন—

আগস্টের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় সিলভেস্টারের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোলো ইয়ানের কাছে। মেরু সমুদ্রে, মেরি বোটের খোলের ভিতর। সেদিন সারাদিনই কঠোর মেহনত গিয়েছে। খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে যাবে, এমন সময় কে যেন চিঠিখানা দিল তাকে। চোখ ভারী হয়ে এসেছে ঘুমে, টিমটিমে হলদে আলোটার নীচে দাঁড়িয়ে সে পড়ল চিঠিটা। পড়ে সেও যেন কেমন হতবুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে গেল, যেমন হয়েছিল সেদিন ইভোন বুড়ী, পেইম্পলে নৌবাহিনীর আফিসে দাঁড়িয়ে। চেতনা যখন ফিরে এল, চিঠিখানা সে জামার ভিতরের পকেটে গুঁজে রেখে আস্তে আস্তে গিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। দারুণ গর্বী মানুষ সে, নিজের হৃদয়ের জ্বালা সে কাউকে বুঝতে দেবে না।

সারা রাত্রি কাঁদল ইয়ান। যতক্ষণ না দিনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাত্রির আঁধারে চোখের জল দেখতে পায় নি সাথীরা, কিন্তু এখন ত পাবে! আর কাঁদা চলে না ইয়ানের, কেউ দেখে ফেললে লজ্জা পেতে হবে। অমন একটা দৈত্যের মত পুরুষ যদি হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে—ছিঃ ছিঃ! না, বন্ধুর স্মৃতির খাতিরেও সে-লজ্জা সইতে পারবে না ইয়ান। জামার খুঁটে চোখ মুছে সে উঠে গেল ছাদে, মন দিল মাছ ধরায়।

কিন্তু মাছ আর ধরতে হল না বেশীক্ষণ।

সমুদ্রের চেহারা পালটে যাচ্ছে। উষার আবির্ভাবের চমকপ্রদ দৃশ্য, অনন্তের মুখ থেকে একটার পর আর একটা আবরণের ক্রমিক উন্মোচনের

অভূতপূর্ব গরিমা, সে-পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক আগে। এখন দিগন্তের দূরত্ব ঘুচে আসছে মুহূর্তে মুহূর্তে, চক্রবাল যেন ঘনিয়ে আসছে মেরির কাছে, আরও কাছে, আরও—আরও—

সমুদ্র পারাপারহীন, একথা কে বলে? এ যে অত্যন্ত ছোট একটা জলাশয়ের মত দেখাচ্ছে! যা ছিল ফাঁকা, শূন্যাকার, তাতে এখন সূক্ষ্ম পর্দার মত কী-সব জিনিস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, একটা অবিচ্ছিন্ন আস্তরণ নয়, টুকরো টুকরো, বিবিধ আকারের সব জিনিস, কোন কোনটার আবার ধরা-বাঁধা আকারও নেই কিছু, নিঃশব্দে এসে সমুদ্রের উপরকার শূন্যস্থানটাতে জুড়ে বসছে, সাদা মসলিনের মত হালকা আর ফুরফুরে। চারিদিক থেকে একসাথে এসে পড়ছে এ জিনিস। মেরি বোট দেখতে দেখতে বন্দী হয়ে পড়ল এর ভিতর। নিশ্বাস নিতে গেলে বাতাসের সঙ্গে কী যেন অন্য কিছুও ঢুকে পড়ছে নাকে, বুকের ভিতরটায় চাপ সৃষ্টি করছে একটা।

কুয়াশা! আগস্টের প্রথম কুয়াশা আজ দেখা দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘন, দুর্ভেদ্য একটা আস্তরণের নীচে সব কিছু হয়ে গেল অদৃশ্য। মেরি বোটের কোন অংশই নজরে আসে না। কেবল সেই সংকীর্ণ গণ্ডীটুকু ছাড়া, যার উপরে লণ্ঠনের বিবর্ণ আলো মূর্ছিতের মত পড়ে আছে।

তা ইয়ান সে-গণ্ডী থেকে বেশ একটু দূরেই আছে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, না পাওয়াই ভাল। চোখের জল যার অঝোরে ঝরতে চাইছে, অন্য চোখের আড়ালে থাকাই তার ভাল।

৯

আগস্ট শেষ হয়ে আসছে। প্রভাতী কুজ্‌ঝটিকার দেখা মিলছে ব্রিটানির পাহাড়ে সমুদ্রেও। এমনি সময়েই পেইম্পলে ফিরে আসে আইসলাণ্ডিয়ারা। এবার আসে নি এখনো।

আজ তিনমাস হল, দুটি বান্ধবহীনা নারী একত্র বাস করছে, মোয়াঁদের প্রাচীন কুঁড়ে ঘরে। বংশানুক্রমে যেখানে বসতি ছিল দুঃসাহসী নাবিকদের, সেখানে এখন একমাত্র বাসিন্দা সেই নাবিকবংশেরই এক

অথর্ব বুড়ী আর এক প্রায় নিঃসম্পর্কীয়া তরুণী কুমারী। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এরা দু'জনেই। শুধু ইভোন বুড়ীই যে একমাত্র স্নেহের জন, অন্ধের নড়িকে হারিয়েছে, তা নয়। বঞ্চনা গৌরের বরাতেও কম জোটেনি। পিতা ত গেছেনই, সেই সঙ্গে সে হারিয়েছে পৈতৃক সম্পদও। আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতা ধনীর দুলালীকে আজ উদয়াস্ত কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে উদরান্নের জন্য।

বাড়িঘর সব নীলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বটে, থাকার মধ্যে আছে ওর সৌখিন শয্যাটি আর রং-বেরং-এর ডজন-খানিক পরিচ্ছদ। সে সব গৌর এই কুঁড়েতেই এনে তুলেছে।

রং-বেরং পোশাক তার অনেক আছে এখনো, তা ঠিক। তবু সে সব পরে না গৌর। যে খেটে খাবে তার পক্ষে যে হাস্যকর হবে ওসব পরা! নিজের হাতে একটা সাদাসিধে কালো পোশাক সে সেলাই করে নিয়েছে সচরাচর পরবার জন্য। পিতৃবিয়োগের পরে শোকপরিচ্ছদ হিসাবে ওটা মানিয়েছে ভাল। ইভোনেরও পরিধানে একই শোকপরিচ্ছদ, সিলভেস্টারের দরুন। কালো ছাড়া অন্য রঙের কারবার নেই এ-বাড়িতে। দেহে কালো, মনে কালো, বর্তমান কালো, ভবিষ্যৎও কালো।

প্রতিদিন সে পেইম্পলে যায় এই প্লাউবাজলানেকের বাড়ি থেকে। পেইম্পলের ধনী গৃহিণীদের সেলাইফোঁড় করে। পোশাক বানানোর হাত ওর খুব ভাল, এটা ও শখ করে শিখেছিল প্যারিতে থাকতেই। এখন তা ওর খুবই কাজে লেগে যাচ্ছে। প্যারিতে গিয়ে বসলে এর চেয়েও জমাটি কারবার ও খুলতে পারত বোধ হয়, কিন্তু পেইম্পল ছেড়ে তার যাওয়ার জো কী? ইয়ান তাকে বেঁধে রেখেছে এখানকার মাটিতে। নিজে সে ধরা ছোঁয়া দেবে না। কিন্তু আপনা থেকে যে ধরা দিয়েছে, তাকে মুক্তি দেবারও ত কোন ব্যবস্থা সে করছে না।

দারিদ্র্য গৌরের ভাগ্যে এসেছে, তা ঠিক। কিন্তু হীনতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। যে-মর্যাদার আসনে সে অধিষ্ঠিতা ছিল, তা সে একেবারে হারায় নি পেইম্পলবাসীদের চোখে। নিজে সে চপলতা দেখায় না কখনো, কাজেই তার সঙ্গে চপল আচরণও কেউ করতে সাহস পায় না। যুবকেরা পথে যখন দেখতে পায় তাকে, সুপ্রভাত জানাবার সময় টুপি খোলে মাথা থেকে।

সারা দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি খেটে খেটে শ্রান্তদেহে যখন গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে সে পেইম্পল থেকে গৃহের দিকে পা চালায়, গিরিসানুর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে থাকে অবসন্ন হৃদয় মন নিয়ে, এক একদিন সমুদ্র থেকে তাজা হাওয়া ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌরের মুখে আর বুকে। কানে কানে কী যেন বার্তা শোনায় তাকে। এক মুহূর্ত উচ্চকিত হয়ে ওঠে গৌর, প্রত্যাশার দৃষ্টি জেগে ওঠে তার চোখে ঐ সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে, তার পরই কান্নার চেয়েও করুণ নৈরাশ্যের হাসিতে চাপা পড়ে যায় সে প্রত্যাশা, নিশ্বাস ফেলে সে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাথরে পাথরে সমাকীর্ণ বন্ধুর পথের উপরে।

এই পথ। প্লাউবাজলানেকে ইভোন বুড়ীর বাড়িতে যেতে হলে এই পথই ভাল পথ। কিন্তু ইভোনের বাড়ির দোরেতেই ত শেষ হয় নি এ-পথ! চলে গিয়েছে সোজা, আরও অনেক দূরে। চলে গিয়েছে পোর্স-ইভেন পেরিয়ে। পথের সে-অংশেও একদিন হেঁটেছিল গৌর, বাবা বেঁচে থাকতে। গিয়েছিল গেয়সদের বাড়ি। ইয়ানকে দেখতে পাওয়ার আশায়। পায় নি দেখতে। তার পরে দুই একবার দেখেছে, তা ঠিক। তবে সে-দেখায় ফল কী হয়েছে? কিছু না।

আর অবশ্য তাকে যেতে হবে না পোর্স-ইভেনে। কোনদিনই না। যদিও মাত্র মাইল দুই প্লাউবাজলানেক থেকে, তবু যাবে না গৌর। কী করতে যাবে? চোখের দেখার জন্য? তা, ইয়ান যখন ফিরে আসবে, গৌরের ঘরের সামনে দিয়েই তাকে সকাল বিকাল হাঁটতে হবে। পেইম্পল যাওয়ার ত দ্বিতীয় রাস্তা নেই! ভালই হয়েছে, জোর বরাত তার যে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে ইভোন বুড়ীর বাড়িতে। অন্য কোন জায়গায় থাকলে ইয়ানকে যখন তখন দেখতে পাওয়ার এ-সুযোগ হত না তার।

অনেক কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এ-যাবৎ আসতে হয়েছে গৌরকে। যখনই ইয়ানের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগও হয়েছে একটু, তখনই একটা করে বিষম ঘা খেয়েছে সে। কোন দিক দিয়েই সে এমন একটু কোমলতার আভাস পায় নি, যাতে আশা করতে পারা যায় যে ইয়ানকে সে পাবে একদিন। কিন্তু তবু, কী রকম যে অবুঝ মন, পাওয়ার আশা ত যায় না তার! এখনও ইয়ানকে সে ভাবে তার বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে। সেই নাচের মজলিসের অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতিই

গৌর নিজের পথেই চলে যাচ্ছে। কাঁপছে এখনও, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বুকের ভিতরকার স্পন্দন হয়ে আসছে সংযত, ক্ষণতরে বিলুপ্ত শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে দেহে মনে—

বাড়িতে এসে দেখে ইভোন নিজের কোণটিতে বসে আছেন, দুই হাতের ভিতর মাথা গুঁজে, চোখের জল ছেড়ে দিয়েছেন অঝোর ঝোরে। টুপির তলা দিয়ে এক গোছা শনের নুড়ির মত চুল ফসকে বেরিয়ে লেপটে যাচ্ছে সেই চড়িয়ে-ভাঙ্গা ভিজে গালের উপরে।

"জানিস গৌর নাতনি! কাঠ কুড়োতে প্লাউবাজলানেকের দিকে গিয়েছিলাম ত! পথে দেখতে পেলাম গেয়সদের সেই ছেলেটাকে। আমার সেই হতভাগাটার কথাই হল ওতে আমাতে। ওরা আজ সকালেই আইসল্যাণ্ড থেকে ফিরেছে। আর বিকালেই এসেছে আমার খোঁজ করতে। তা আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি কাঠ কুড়োতে। ছেলেটা খুব কাঁদল, জানিস? খুব কাঁদল। তারপর আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল, আমার কাঠের বোঝাটাও ত বয়ে আনল ওই।"

গৌর শুনে যাচ্ছে। শুনছে আর হা হা করে উঠছে বুকের ভিতরে। ইয়ান একবার তাহলে এবাড়িতে এসে গিয়েছে এরই মধ্যে। তখন গৌর ছিল না। থাকলে হয় ত কথাবার্তার সুযোগ হতেও পারত। আর কি আসবে ও?

শীত এল শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে, শ্বেত শবাচ্ছাদনের মত তা ধীরে ধীরে আরও চেপে বসল পৃথিবীর দেহটাকে ঢেকে দিয়ে। ধূসর দিনের পরে ধূসর দিন, তার পরে আরও, আরও। ইয়ান আর এল না। বিজন গিরির কোলে ভাঙ্গা ঘরে দু'টি নারী দিন কাটায় পরস্পরকে অবলম্বন করে।

শীত চেপে আসছে। সংসারের খরচা বেড়ে যাচ্ছে দিনের দিন। কাঠ সংগ্রহ দুঃসাধ্য ব্যাপার এখন।

বেচারী বুড়ী! সব দিন তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকেন না এখন। যেদিন থাকেন, গৌরকে যেন আদরে যত্নে মুড়ে দিতে চান একেবারে। সে-স্নেহ দাগ কেটে বসে যায় গৌরের মনে। পরে যেদিন বুড়ীর আচরণে পাগলাটে ছিট দেখা দেয়, নানা রকমের অশান্তির কারণ ঘটতে থাকে তার দরুন, সেদিন গৌর কিছুতেই রাগ করতে পারে না তাঁর উপরে। এখন তিনি ভুল বকেন প্রায়ই, গালিগালাজও করেন গৌরকে।

প্রতি হপ্তাতেই তুই একবার হয় এরকম। বিনা কারণেই হয়। গৌরের তখন চলে অগ্নিপরীক্ষা।

অবশেষে এমন একদিন এল, যখন সিলভেস্টারের কথাও বুড়ীর স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। গৌরকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন —"সিলভেস্টার? কোন্‌টা বল ত? জানো গৌর, এত কাচ্চাবাচ্চা ছিল আমার, কোনটার কী নাম, মনে নেই এখন আর! এত ছেলে, এত মেয়ে! এত মেয়ে, এত ছেলে! আজ কেউ নেই, একটাও নেই—নেই-নেই—'

বলতে বলতে দুটো হাত ছুঁড়ে দিচ্ছেন উপর পানে, যেন প্রতিবাদ করতে চাইছেন কোন একজনের অবিচারে—

তার পর দিনই হয়ত আবার বেশ ভালভাবেই মনে করতে পারবেন তাকে। কবে সে কী বলেছিল, কী করেছিল, শৈশবে, কৈশোরে, প্রথম যৌবনে, খুঁটিনাটি ধরে ধরে একটি করে শোনাবেন গৌরকে আর সারাদিন হাপুস নয়নে কাঁদবেন—

কী করে কাটে এই শীতের সন্ধ্যাগুলো? আগুন জ্বালাবার কাঠ নেই এক কুচো। ঠাণ্ডায় বসে সূঁচের ফোঁড় দিয়ে দিয়ে যাওয়া কী যে কষ্টের! ঘুমানোর আগে এ সেলাইটা শেষ করাই চাই। কারণ এটা দিয়ে দেবার দিন। দিতে পারলেই নগদ কিছু আসবে, দিন গুজরান হবে তাতে। সারা দিন ত পেইম্পলের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেলাই সে করেই, সন্ধ্যাবেলা এক গাদা সেলাই আবার ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে আসে। দুই দুটো পেট ত।

সন্ধ্যাবেলায় কাজ ত রয়েছেই, আর এক ঝামেলা তার উপরেও। বুড়ীর সঙ্গে গল্প না করলে চলে না। ও চুপচাপ সেলাই করে যাচ্ছে দেখলে ইভোন রেগে যান, "তোর মুখও সেলাই করে নিয়েছিস নাকি, ঐ জামাগুলোর সাথে সাথে?" বলে ওঠেন এক সময়—"কালে কালে কত না অনাছিষ্টি দেখব! আগে আগে মেয়েদের মুখে খই ফুটত! দুটো চারটে কথা যদি তুই বলিস বাপু, সময়টা কাটে একরকম।"

কাজে কাজেই এটা ওটা গল্প বলতেই হয় গৌরকে, সারাদিনে কী দেখে এল পেইম্পলে, কী বা শুনে এল—ইনিয়ে বিনিয়ে আজে বাজে গল্প, নিজের যা একদম অপছন্দ।

সমুদ্র থেকে হা হা করে ছুটে আসে বাতাস। জরাগ্রস্ত পাথরের দেওয়ালে ফুটো বেরিয়েছে নানা জায়গায়, তারই ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে এক একটা ঝাপটা, আলোটা কেঁপে কেঁপে ওঠে মুহুর্মুহু। হাওয়ায় ভর করে আসে ঢেউয়ের শব্দ, চোখ বুজলেই গৌরের মনে হয় সে বুঝি কোন বোটের কেবিনে বসে আছে। যেমন কেবিনে মেরুর সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ইয়ান, এই সেদিনও ঘুরে বেড়াত তার মামাতো ভাই সিলভেস্টার, তারও আগে সিলভেস্টারের বাবা, ঠাকুরদা সবাই। সবাই তারা মরে গিয়েছে। সমুদ্রেই মরেছে অনেকে। মরার পরে অবশ্যই এই ঘরেই ফিরে এসেছে তাদের আত্মা। এখনও যে সে আত্মারা এই ঘরের চালে চালে ঘোরাফেরা করছেন না, একথা কে বলতে পারে?

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। বুকের ওপর তাড়াতাড়ি ক্রুশ চিহ্ন আঁকে আঙুল দিয়ে। আর সেই সময়ই ওদিককার আঁধা র কোণ থেকে রুগ্ন শিশুর মত ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ইভোন দুই কলি গান গেয়ে ওঠেন ঘুমের ঘোরে—

"স্বামী আমার গেল চলে
আইসল্যাণ্ড যাব বলে,
একটা ফ্রাঁও ত আমার হাতে দিয়ে গেল না—
স্বামীটি ত গেল চলে
দিন যে আমার কিসে চলে,
সেই কথাটা পাঁচ জনাতে আমায় বল না।"

শীতের দিন শুধু শীতেরই দিন নয়, বৃষ্টিরও। সে-বৃষ্টি ঝরছেই সারা রাত, কে যেন আকাশ থেকে একটা ফোয়ারার মুখ খুলে দিয়েছে উলটো দিক পানে। ঘরের পুরোনো চালে শ্যাওলা জমেছে যেখানে, শ্যাওলার উপর দিয়েই জল সেখানে গড়িয়ে নামে। যেখানে তা জমেনি, সেইখানেই চাল ফুটো করে জল পড়ে, কোথাও দেওয়াল বেয়ে, কোথাও বা ঘরের একেবারে মাঝখানে। কত জায়গাতেই যে মেজেটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে ওরই দরুন!

জল! জল! চারিধারে! এই গোটা শীতকালটাই। প্লাউবাজলানেকের বাড়িগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই জলের দরুন। যেখানে একটা উপত্যকা, সেখানেই জল। যেখানে রাস্তার ধারে নরদমা

একটা, জল সেখানেও। বাড়িগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে ভিজে জবজবে হয়ে রয়েছে, বাড়ির বাসিন্দাগুলোর হাড়ে হাড়ে সেই জল যেন সারাক্ষণ ঢুকতে চাইছে নিশ্বাসের সঙ্গে।

রবিবার সন্ধ্যাগুলোই গৌরের পক্ষে সব চেয়ে বেশী কষ্টের। কারণ অন্য সব জায়গাই ঐদিন ঐ সময়টা আনন্দকলরবে মুখর। পোর্স-ইভেন থেকে প্লাউবাজলানেক থেকে যুবকেরা দল বেঁধে চলে যায় পেইম্পল। সারা সন্ধ্যা, নাগাদ দুপুর রাত পর্যন্ত হই-হল্লা করে করে অবশেষে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করেই ফিরে যায় যে যার ঘরে। নীরবে যায় না। গানে গল্পে নৈশ গিরিপথ উচ্চকিত করতে করতেই যায়। পথ তাদের মোয়াঁদের বাড়ির সামনে দিয়েই। তাদের কলরবের উদ্দেশে কান পেতে থাকে শয্যালীনা গৌর, কী জানি যদিই ইয়ানের গলা শুনতে পাওয়া যায় পাঁচটা ছোকরার কোলাহলের ভিতর! শুনলেই গৌর ধরে ফেলবে সে-গলা।

যদিই কোন সময় মনে হল যে সত্যিই শোনা গিয়েছে সে-স্বর, শুয়ে শুয়েই কেঁপে উঠল গৌর।

ইয়ান এটা দস্তুরমত অভদ্রতা করেছে। সেই একদিন ছাড়া এবাড়িতে আর আসে নি। এতদিনের বন্ধু সিলভেস্টার! তার বুড়ী ঠাকুরমা কীভাবে বেঁচে আছে, মাঝে মাঝে দেখতে আসা কি উচিত ছিল না তার? কেন যে আসেনি বোঝা কঠিন। গৌর আর বুঝতে পারছে না ইয়ানের মনের গতি। ওকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলে মেনে নিতে পারলে এ আচরণের একটা ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তা মেনে নিতে পারে কই গৌর?

আসল কথা, এবার সমুদ্র থেকে ফিরে আসা অবধি ইয়ান যে-ধরনের জীবন-যাপন করছে, এক কথায় তাকে বলা চলে উচ্ছৃংখল। প্রথমেই ধর, গ্যাসকনি উপসাগরের দিকে সেই বার্ষিক অভিযানটা গেল। বেশ কিছুদিন ইয়ান কাটিয়ে এল সেখানে, বেশ কিছু পয়সা সেখানে উড়িয়ে এল নিষিদ্ধ আমোদ-প্রমোদে। সেখান থেকে গেল বোর্দো, সেখানেও ঐ পাঠেরই পুনরাবৃত্তি। ব্রিটানিতে ফিরল ইয়ান নভেম্বরে, এসে দেখল তার বেশ কয়েকজন বন্ধুরই বিয়ে আসন্ন। প্রত্যেকটাতেই নিতবর নির্বাচিত হয়েছে সে নিজেই। এ সবে তার আপত্তি নেই কোনদিন। খুব আনন্দ করল সব কয়টা বিয়েতেই, ভাল ভাল পোশাকে সেজেগুজে অনেক নাচল, অনেক খানাপিনা করল।

এসব কথা কি গৌরের কানে পৌঁছয় না? সুদিনে তার বান্ধবী ছিল অনেক পেইম্পলে। এখন দুর্দিনে গৌর তাদের সঙ্গে মেশে না তেমন, কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা এসে জোটে গৌরের পাশে। আর ইয়ানের সব কুকীর্তির কথা ফলাও করে শোনায় তাকে।

ফলে এখন গৌর তাকে এড়িয়ে চলতেই চায়। এমনটা কয়েকবারই হয়েছে যে পথ চলতে চলতে হঠাৎ গৌরের চোখে পড়ে গেল—ইয়ান আসছে ঐ। অমনি সে ঘুরে অন্যদিকে চলে গিয়েছে। ইয়ানেরও ঠিক ঐ ব্যাপার। গৌরকে দূরে দেখতে পেলেই সে ভিন্ন পথে চলে যাবে, পথ যদি সেখানে না থাকে ত বন বাদাড় ভেঙেই!

দু'জনেই এড়িয়ে চলেছে দু'জনকে, সর্বপ্র যত্নে।

* * *

পেইম্পলে হোটেল মাত্র একটাই। সেই হোটেলে বসেই একদিন হোটেলওয়ালীর জন্য একটা ফ্রক সেলাই করছে গৌর, এমন সময়ে তার কানে এল কথাটা। মেরি বোটের কাপ্তেন এবার লিওপোল্‌ডাইন বোট নিয়ে বেরুচ্ছেন মাছ ধরতে। ইয়ানও যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে।

লিওপোল্‌ডাইন! নামটা গৌরের স্মৃতিতে দাগ কেটে বসে গেল।

বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় ঐ নামটা নিয়েই মনে মনে তোলপাড় করছে গৌর। কেমন যেন ভাল লাগছে না! এত কাল ইয়ান মেরির সঙ্গে গিয়েছে। মেরির উপরে মেরি মাতার করুণা ছিল, শত ঝড়ঝাপটাও তার ক্ষতি করতে পারেনি কোনদিন। এই নতুন বোট কেমন হবে, কে জানে। নামটা নতুন রকম। নতুন জিনিসকে বিশ্বাস নেই। ভাল লাগছে না গৌরের।

তারপরই সে হাসল। বড় দুঃখের হাসি এ। ভাল লাগা? গৌরের ভাল লাগাতে কী আসে যায় ইয়ানের? তার সঙ্গে সব সম্পর্কই কি চুকে যায়নি?

চুকে যে যায় নি, তা কয়েকদিনের মধ্যেই আচমকা প্রমাণ হয়ে গেল?

সেদিন সন্ধ্যার আগেই গৌর বাড়ি ফিরছে। প্লাউবাজলানেকের কাছাকাছি আসতেই একটা গোলমাল কানে এল তার। অনেকগুলো ছেলেছোকরার উঁচু গলা আর তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে একটা বুড়্‌টে ভাঙ্গা গলা, যেটাকে ইভোন বুড়ীর কণ্ঠস্বর বলে চিনতে মোটেই কষ্ট হল

না গৌরের। কী যেন কী ঘটেছে, একটা দারুণ ভয় হল ওর মনে। তাড়াতাড়ি ও পা চালিয়ে দিল।

একটা কিছু হয়েছে বটে। ইভোন বুড়ীর গা-হাত-পা কেটে গিয়েছে, পোশাক কাদামাখা। পড়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়। ছুটতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। এখনও মাঝে মাঝে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন এক একটা ছেলেকে তাড়া করে। গোটা দশ বারো ছেলে, তাদের মধ্যে পনেরো বছরের ছেলেও আছে যেমন, তেমনি আছে পাঁচ বছরেরও।

"আমার বেড়ালটাকে ওরা মেরে ফেলেছে, এই দেখ, পাথর ছুড়ে ছুড়ে মেরে ফেলেছে"—গৌরকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ইভোন। তাঁর পোষা বেড়ালটা পড়ে আছে বুড়ীর পায়ের কাছে।

এখন কথা এই, বেড়ালটা ইভোনের খুব আদরের হলে কী হবে, পাড়ার ছেলেদের চক্ষুশূল। তার কারণ ওর চেহারা। সাদা তার গোটা দেহ, কিন্তু মুখখানা মিশকালো। এই অদ্ভুত আকৃতির দরুন ছেলেদের ভিতর একটা কুসংস্কার আছে যে ইভোনের বেড়ালটা আসলে বেড়াল নয়, ছদ্মবেশী শয়তান ও। তাই ওকে মেরে ফেলবার জন্য অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছে ওরা, আজ পথের মাঝে ওকে পেয়ে বড় বড় পাথরের ঘায়ে ঘায়েল করে ফেলেছে একেবারে।

গৌরের কাছে নালিশটা পৌঁছে দিয়েই ইভোন আবার তাড়া করে গেলেন ছেলেগুলোকে। আবার পড়লেন, এবারে প্রায় অজ্ঞান হয়ে। আর তাঁকে ঐ অবস্থার ভিতর থেকে কী করে সুস্থ করে ঘরে নিয়ে যাবে, ঠিক করতে না পেরে গৌর মর্মবেদনায় কেঁদে ফেলল।

"তোদের লজ্জা করে না, হতভাগা ছেলেদের দল?" বাজের আওয়াজের মত একটা ধমক হঠাৎ কানে যেতেই গৌর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, ছেলের দল দুদ্দাড় করে পালিয়ে যাচ্ছে, আর ইয়ান করুণ নেত্রে ইভোনের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

ইভোনকে পাঁজাকোলো করে ইয়ানই নিয়ে গেল তাঁর বাড়িতে। মনে বড় অনুশোচনা হয়েছে ইয়ানের। সিলভেস্টার ছিল তার প্রিয়বন্ধু। বলতে গেলে একমাত্র বন্ধুই। সে মারা গেল যখন, তার অসহায় ঠাকুরমাকে দেখাশোনা করা তারই কর্তব্য ছিল। সে কর্তব্য সে পালন

করেনি, করেছে এই গৌর, নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আর গৌর, গৌর যে ইয়ানকে কী চোখে দেখে, তাও ত অজানা নেই ইয়ানের।

আজ তাই বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরে আসবার পরে, ইয়ান মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল—"মামোয়াজেল গৌর, আপনার মনের ভাব যদি বদলে গিয়ে না থাকে—মানে, আমি নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছি—আপনি যদি এখনও আমাকে—

১০

দুই দু'টো বৎসর। যে মিলন দুই বৎসর আগে ঘটতে পারত, আজ তাই ঘটতে যাচ্ছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ির মধ্যে। তাড়াতাড়ি, কারণ মাস-খানিকের ভিতরই আইসলাণ্ডিয়াদের বেরিয়ে পড়তে হবে সমুদ্রে। লিওপোল্‌ডাইন ইতিমধ্যে ভেসে যাবে জলে। নাবিকদেরও তৈরী হয়ে নেওয়া চাই ইতিমধ্যে।

তা তৈরী হবে বই কি ইয়ান! অবশ্যই হবে। কিন্তু বেরুবার আগে বিয়েটা তার সেরে ফেলা চাই। কাগজপত্র তৈরী করাটাই হাঙ্গামার কাজ, সময়-সাপেক্ষ কাজ। গির্জায় বিজ্ঞপ্তি লটকাবার পরে পুরো পনেরোটা দিন বাদ দিয়ে তবে বিয়ে হতে পারবে, সেইটাই নিয়ম। এ নিয়মের হেরফের হওয়ার কোন উপায় নেই।

উপায় নেই যখন, বাদ দিতেই হবে পনেরোটা দিন। তারপর বিয়ে। তারপর হাতে থাকবে সাকুল্যে ছয়টি দিন মাত্র। এই ছয় দিনের নিবিড় সাহচর্যের স্মৃতিটুকু সম্বল করে ইয়ানকে ভাসতে হবে অকূল দরিয়ায়, গৌরকে বিরহ যাপন করতে হবে দীর্ঘ চার মাস কাল, মেরি মাতার চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করে করে।

ইয়ানের বাবা বলেছিলেন, অত তাড়াতাড়িতে কাজ নেই, কথা ত ঠিকই হয়ে রইল। ইয়ান ফিরে আসুক সমুদ্র থেকে, হেমন্তের গোড়াতেই বিয়েটা হবে। সে পরামর্শ মোটেই পছন্দ হয়নি ইয়ানের। গৌরেরও না। কাজেই বৃদ্ধ গেয়স পরামর্শটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

পনেরো দিন সময় পাওয়া যাচ্ছে শুভানুষ্ঠানের আগে। পূর্বরাগের ললিত লীলায় একটানা একটা সুখস্বপ্নের মতই কেটে গেল সে পনেরো দিন। গত দুই বৎসরের ব্যথা ও বেদনা, সংশয় ও অবিশ্বাস, অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার রোমন্থনেই পক্ষকাল সময় কোন্ দিক দিক দিয়ে পেরিয়ে গেল, দুই জনের একজনও টের পেল না।

আশ্চর্য ব্যাপার, বৃদ্ধা ইভোন যেন হঠাৎই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন আবার। নিজের বাড়িটা তিনি গৌরের নামে দানপত্র করে দিয়েছেন, বিয়ের পরে ইয়ান আর গৌর এই বাড়িতেই থাকবে। তা আছে, বাড়ি ছোট হলেও দুটো কামরা শুতে আছে। সেদিক দিয়ে অসুবিধা কিছু হবে না।

একদিন পেইম্পল গিয়ে গৌরের বিয়ের পোশাক কিনে নিয়ে এল ইয়ান। মিভেল মারা গিয়েছেন অল্পদিন আগেই, কাজেই শোক-পরিচ্ছদ বর্জন করা এখনই চলছে না গৌরের। তা হোক, কালো পোশাকেও বাহার ফোটানো যায়। গৌর নিজে পাকা দরজী, নিজেই ফরমাশ করল—ঠিক কীরকম পরিচ্ছদ হলে দুই দিকই রক্ষা হবে।

শুভ দিনে বিয়ে হয়ে গেল। গেয়সদের বাড়িতে সমারোহ হল খুব। আত্মীয় বলতে যে যেখানে ছিল, কাউকেই নিমন্ত্রণ করতে বাকী রাখেন-নি গেয়সকর্তা। লোকে লোকারণ্য বাড়িতে। ভোজের পরে নাচ। নাচ সবে জমে উঠেছে, এমন সময়ে এল মুষলধারে বৃষ্টি। তার সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব। বাড়ির ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বজ্রের নির্ঘোষে আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে গৌরের অন্তরাত্মাও। অভাগিনীর জীবনে প্রথম ভাগ্যোদয়ের ক্ষণেই প্রকৃতির এ রুদ্রমূর্তি কেন ?

মনকে অবশ্য বোঝানো চলে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু বিরল বস্তু নয় ব্রিটানিতে। ও জিনিস চিরকাল হচ্ছে এদেশে, হবেও চিরকাল। ওর সঙ্গে নিজের ভাগ্যের যোগাযোগ কল্পনা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। কিন্তু বোঝানো সত্ত্বেও মন যে বোঝে না!

বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক। ঝড়টা থামতেই গেয়সকর্তা ইয়ানকে ইশারায় ডেকে বললেন—"এবার তোমরা বাড়ি যাও। এখানকার নাচ রাতভোর চলবে। তোমরা বসে থেকো না।" ইয়ান বেরিয়ে পড়ল গৌরকে নিয়ে পিছনের দরোজা দিয়ে। বেরুলে কী হবে। রাস্তায় হাঁটু জল। পোর্স

ইভেন থেকে প্লাউবাজলানেক পাকা দুই মাইল পথ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ। গৌরের সাধ্য ছিল না রাত্রির অন্ধকারে এই জল ভেঙ্গে বাড়ি পৌঁছানো। ইয়ান তাকে কাঁধে তুলে নিল সুতরাং।

ছয় দিনের স্বর্গসুখ। তারপর ইয়ানকে বিদায় নিতে হল স্বর্গ থেকে। যাত্রার দিন সকালবেলাতেই ইয়ানকে পেইম্পল বন্দরে হাজির হতে হল। সারি সারি সমুদ্রযাত্রী বোটগুলি বাঁধা রয়েছে জেটিতে জেটিতে। কুমারীদের মিছিল বেরিয়েছে যাজককে পুরোভাগে নিয়ে। তিনি মেরি মায়ের নির্মাল্য বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রতি বোটে।

ইয়ানের সঙ্গে গৌর ত এসেছেই, এদিক থেকে ইভোন বুড়ী, ওদিক থেকে গেয়সেরা কর্তা গৃহিণী মায় ইয়ানের চোদ্দটা ভাইবোন সবাই এসেছে। সবাই বিষণ্ণ, কিন্তু চোখের জল সযত্নে রোধ করে রেখেছে সবাই, পাছে তাদের কাঁদতে দেখলে ইয়ান কাতর হয়ে পড়ে। সবাই পেরেছে চোখ দুটিকে শুকনো রাখতে, কিন্তু গৌর তা পারে কই? ইয়ান যখন বিদায় নিয়ে বোটে উঠছে, গৌরের তখন দুচোখ দিয়ে ধারা নামছে তপ্ত অশ্রুর।

এইবার বোটে উঠতে হল ইয়ানকে। ছাই-রঙ্গা পালগুলি মেলে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিম থেকে আসছে হালকা হাওয়া, তারই ছোঁয়া লেগে স্ফীত হয়ে দুলছে তারা। ইয়ানকে এই দূর থেকেও বেশ চিনতে পারছে গৌর, ইয়ান মাথার টুপি হাতে নিয়ে নাড়ছে উঁচু করে। তাকিয়েই আছে গৌর, দেখছে কেমন করে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে ইয়ানের মূর্তি, দূর থেকে আরও দূরে।

লিওপোল্‌ডাইন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, গৌর তারই গতি অনুসরণ করে হেঁটে চলেছে ডাঙ্গাপথে, গিরিসানুর পথ বেয়ে বেয়ে। কিন্তু এক সময়ে থামতে হল তাকে, কারণ ডাঙ্গা আর নেই, সমুখে অথই জল। ঐখানে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় আর ফার্জের ঝোপঝাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এক অতিকায় দারুমূর্তি ভগবান যীশুর। তাঁরই পায়ের কাছে সেইখানে বসে পড়ল গৌর দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে। জায়গাটা উঁচু, এখান থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হয়—দূরে যেন জলতল উপর দিকে ঢালু হয়ে আকাশে মিশেছে গিয়ে। সেই ঢাল বেয়ে লিওপোল্‌-ডাইন ক্রমেই যেন উঠে যাচ্ছে উঁ থেকে আর উঁচুতে। ধীরে আন্দোলিত

হচ্ছে সমুদ্রতরঙ্গ। দিগন্তের ওধারে কোথায় হয়ত কী আলোড়ন ঘটেছে অপার জলবিস্তারের অন্তস্তলে, তারই ক্ষীণ রেশ হয়ত এই মৃদু মৃদু দোলানি।

গৌর তাকিয়েই আছে, যদিও অদৃশ্য হয়েছে লিওপোল্‌ডাইন। বসে বসে স্মরণ করার চেষ্টা করছে জাহাজখানার খুঁটিনাটি গঠনবৈশিষ্ট্য। যাতে যেদিন ফিরে আসবে লিওপোল্‌ডাইন। ও যেন দূর থেকে দেখেই চিনতে পারে যে লিওপোল্‌ডাইনই এল ঐ।

এইবার পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে বিশাল সব ঢেউ, একটার পরে আর একটা, উপকূলকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেওয়ার বৃথা চেষ্টায়। আকাশ বাতাস শান্ত স্তব্ধ, তাদের নীচে এই জলরাশির কেন যে এত উদ্দামতা, ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে গৌরের।

লিওপোল্‌ডাইনকে দেখা যাচ্ছে না আর। হাওয়া আজ নেই, তবু কেন তার এত দ্রুত গতি? হয়ত অদৃশ্য কোন জলতলবাহী-আন্তঃস্রোতের আকর্ষণে সে ছুটে বেরিয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি। একটা ধূসর বিন্দু, দৃষ্টিপরিধির শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেচে বোটখানা, এইবার অনন্তের অঞ্চলতলে ও লুকিয়ে যাবে দীর্ঘদিনের জন্য, যেখানে রাজত্ব বুঝি অবিমিশ্র তমিস্রার!

সাতটা বাজল। রাত্রি নেমেছে। বোট অদৃশ্য হয়েছে। গৌর বাড়ি ফিরছে। চোখে জল, বুকে তবু সাহস বেঁধে রেখেছে অনেক চেষ্টায়। মন্দের ভাল। এবারও যদি ইয়ান সমুদ্রযাত্রা করত, আগের দুই বছরের মত, তাকে একটি কথাও না বলে, তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার না করে তা হলে যে গৌরের দশা আরও মর্মান্তিক হত!

এখন কিন্তু পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে, মধুর হয়ে উঠেছে। ইয়ান আজ নিঃসম্পর্কীয় নয়, একান্তভাবে তারই নিজস্ব। যেতে হয়েছে, যাক। কিন্তু গিয়েও সে অমৃতের ভাণ্ডার রেখে গিয়েছে তার কাছে, ছয় দিনের অফুরন্ত অমৃতস্মৃতি, জীবনব্যাপী অমৃতমিলনের অপার প্রতিশ্রুতি। একাই আজ বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাকে, কিন্তু এই ত কয়েকটা মাস মাত্র! হেমন্ত আসবে একদিন, খুব তাড়াতাড়িই আসবে, সেই হেমন্তের প্রথম উষাগমে ইয়ানের লিওপোল্‌ডাইন দেখা দেবে দিগন্ত রেখায়, মৃদু মৃদু আন্দোলিত তরঙ্গচূড়ায়।

* * *

হেমন্ত আসবে ঠিকই, কিন্তু এখনও গ্রীষ্মকাল চলছে—বিষণ্ণ, উষ্ণ, প্রশান্ত। গৌর তরুশাখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের পাতায় পাতায় হলদে ছোপ লাগতে আর দেরি কত। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে শীতের পাখি সোয়ালোদের একটা ঝাঁক কোথাও ডানা মেলেছে কিনা মৃদুল হাওয়ায়, বাগানের কেয়ারিতে কেয়ারিতে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায় চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ে একটাও কুঁড়ি ধরেছে কিনা।

কয়েকখানাই চিঠি সে ইয়ানকে লিখেছে পরপর, ডাকজাহাজের মারফত। কিন্তু সেগুলি ইয়ানের কাছে পৌঁছোলো কিনা, ঠিক কী ?

জুলাইয়ের শেষে অবশ্য একখানা চিঠি সে পেল ইয়ানের কাছ থেকে। বেশ ভাল আছে সে, লিখেছে ইয়ান। এবার মাছ খুব ভাল উঠবে বলে আশা করা যায়। সে নিজে ইতিমধ্যেই দেড় হাজার মাছ ধরে ফেলেছে। চিঠির ঠিকানায় লেখা আছে "মাদাম মাগুয়ারেট গেয়স, মোয়াঁদের বাড়ি, প্লাউবাজলানেক"। নিজের নামে গেয়স পদবী যুক্ত দেখে একটা আনন্দের শিহরন গৌরের মনে।

আগস্টের শেষ দিকে একদিন প্রথম আইসলাণ্ডিয়া বোট ফিরে এল সমুদ্র থেকে। দেশসুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়ল বন্দরে—"কারা এল ? কারা এল ? কোন বোট এটা ?"

"সামুয়েল আজেলিড" এটা। ফী বছর এই বোটই ফিরে আসে সকলের আগে। ইয়ানের বুড়ো বাবা বললেন—"তোমরা শুনে রাখো আমার কথা, লিওপোল্ড়াইনেরও আর দেরি নেই ফিরতে। ওদিককার রীতিই এই, একটাকে ফিরতে দেখলে আর সবাইও সুড়সুড় করে তার পিছু নেয়।"

একটার পরে আর একটা, আসছেই আইসল্যাণ্ডিয়ারা। দ্বিতীয় দিন দু'টো বোট, তারপর দিন চারটে, তারপর এক হপ্তার মধ্যেই আরও বারোখানা বোট। সারা দেশ আহ্লাদে আটখানা, প্রায় প্রতি বাড়িতেই কেউ-না-কেউ ফিরেছে, স্ত্রীরা, মায়েরা নতুন উৎসাহে মন দিচ্ছে ঘর-করনায়।

অবশ্য দেরি করছে অনেকেই এখনো। দশখানা বোটই ফেরেনি। তাদের মধ্যে লিওপোল্ড়াইনও একখানা। তবে আর বেশী দেরি করা ত

সম্ভবই নয় ওদের। এলো বলে। গৌর অধীর হয়ে উঠেছে। বাড়িঘর দশবার করে গুছিয়ে রাখছে, ছিমছাম পরিপাটি সব। আর কিছু করবার নেই, এখন ইয়ান এলেই হয়।

আরও তিনখানা বোট ফিরল। তারপর আরও পাঁচখানা। এখন বাকী রইল মোটে ছু'খানা। ঐ লিওপোল্‌ডাইন আর আর মেরি-জাঁ।

গাঁয়ের লোক হেসে বলে গৌরকে—"এবার পৃষ্ঠরক্ষার ভার নিয়েছে ওরাই ছু'টি, মেরি-জাঁ আর লিওপোল্‌ডাইন।"

কিন্তু এ কী হল! দিনের পর দিন কেটে যায়। ঐ ছুখানি ত ফেরে না! গৌর উদ্‌গ্রীব রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। প্রসাধনে অসাধারণ পারিপাট্য আজকাল তার। রোজ সে বন্দরে গিয়ে অপেক্ষা করে—কতক্ষণে দেখা যাবে লিওপোল্‌ডাইনের পাল। অপেক্ষা করে করে এক সময় বাড়ি ফেরে যখন, হঠাৎ সেই সময়টা বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে কী যেন একটা! কী এটা? ভয়?

ভয় হ্যাঁ—ভয়ই—অর্থাৎ যদি—

সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ আজ। দিনগুলো কী তাড়াতাড়ি যায় যে! ফ্যাণ্টা ফ্লুওরির সঙ্গে গলিতে দেখা গৌরের। সে মোম জ্বালাতে যাচ্ছে গ্রামপ্রান্তের উপাসনা মন্দিরে, মেরি মায়ের সামনে। গৌরকে দেখে অকারণে তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল—"এক হপ্তা আগে সবাই ফিরেছে ট্রেগুয়ার আর সেণ্ট ব্রিয়ক থেকে, জানো?"

ফ্যাণ্টা হল লিওপোল্‌ডাইনের মেট ফ্লুওরির স্ত্রী।

গৌরের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। ঘর থেকে ছুটো মোম নিয়ে এসে সেও মন্দিরে চলল মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য।

তারপর দিনই সমুদ্রে বোট দেখা দিল একখানা। কে? কে? কারা? লিওপোল্‌ডাইন, না মেরি জাঁ? মেরি জাঁ, না লিওপোল্‌ডাইন? গৌর চোখ বুজে রয়েছে। তাকিয়ে দেখতে ভয় করছে—যদি লিওপোল্‌ডাইন না হয়? যদিই না হয় ইয়ানের বোট?

সত্যই না, লিওপোল্‌ডাইন নয় এ। মেরি-জাঁ—মেরি জাঁ—

কে যেন জিজ্ঞাসা করল মেরি জাঁর কাপ্তেনকে—"লিওপোল্‌ডাইনকে দেখনি?"

যেন পরম সত্য হয়ে আছে তার জীবনে। পরবর্তী কালের যত কিছু বিরূপ ব্যবহার ইয়ানের, যত কিছু নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান, এ সব কেই অস্বীকার করে এসেছে গৌর অবান্তর ঘটনা বলে।

সেই এক রাত্রির আদানপ্রদান, ইয়ান তাকে ভুলে যাওয়ার ভান করলে কী হবে, গৌর তাকে স্মৃতিপটে সযত্নে তুলে রেখেছে পরম সত্য, অলঙ্ঘ্য শপথ বলে।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমনি সময়েই রোজ ঘরে ফেরে গৌর! আর রোজই ইভোন বুড়ী অনুযোগ করেন—"আজ তোর দেরি হয়েছে ফিরতে—"

"না, ত"—মোলায়েম মিষ্টি সুরে জবাব দেয় গৌর—"না ত ঠাকুরমা! অন্য দিনও যেমন আসি, আজও তেমনি এসেছি, ঠিক সময়ে!" বুড়ীর যে বাহ্যজ্ঞান এখন কমই আছে, তা সর্বদাই মনে থাকে গৌরের!

তা বলে বুড়ী যে ঘরেই বসে থাকেন সারা দিন, তাও নয়। তা থাকলে ত বরং নিশ্চিন্ত হতে পারত গৌর। ঠাকুরমার যা শরীর এখন, বেরুনো মানেই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। সোজা হাঁটার সামর্থ্য নেই আর, চোখেও ঝাপসা দেখেন। মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে না পড়েন, তাও নয়। পথে যদি কেউ থাকে তখন, তুলে দেয় হাত ধরে। না যদি থাকে কেউ, বুড়ীকে হয়ত পথেই পড়ে থাকতে হয় দু'এক ঘণ্টা, যতক্ষণ পথিক কেউ এসে না পড়ে। এমনিভাবে পড়ে থাকতে থাকতে কবে হয়ত বুড়ী পথে পড়েই মরে যাবে, এ ভয় গৌরের সারাক্ষণই আছে।

অথচ বেরুনোর প্রয়োজন কিছু মাত্রই নেই বুড়ীর। তাঁর যা-কিছু দরকার, সব হাতের কাছে যুগিয়ে দিচ্ছে গৌর। খাওয়ার সময় হাতে ধরে টেবিলে বসিয়ে দিচ্ছে, ঠাণ্ডার সময় আগুনের কাছটিতে টেনে দিচ্ছে তাঁর চেয়ার, কাপড় ছিঁড়লে রিপু করে দিচ্ছে—

তবু বুড়ী বেরুবেনই। গৌর ত বাড়ি বসে থাকতে পারে না তাঁকে আগলাবার জন্য!

যা হোক, বিপদ এখনও কিছু ঘটেনি বুড়ীর। দিন চলছে—

অবশেষে একদিন, পেইম্পলে এক বাড়িতে কাজ করতে করতে, সেই বাড়িরই লোকেদের বলাবলি করতে শুনল গৌর—

কী শুনল? শুনল যে 'মেরি' বোট ফিরে এসেছে সমুদ্র থেকে।

খবর শোনা মাত্রই গৌরের যেন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। এত যে

ধৈর্য ধরে সে জীবিকার পিছনে পিছনে ঘুরছে এই তিন মাস, তা যেন কার ফুৎকারে এক মুহূর্তে উবে গেল তার অন্তর থেকে। কোনমতে হাতের কাজটা সেরে ফেলে সে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করত সেই মুহূর্তে—"কেন করছ তাড়াতাড়ি?"—তা হলে নিশ্চয়ই সে-প্রশ্নের সে কোন জবাবই দিতে পারত না।

চলেছে পথ ধরে, গৌর দেখল ওদিক থেকে ইয়ান আসছে।

পা কাঁপতে লাগল গৌরের। পড়ে যাবে নাকি সে? ইয়ান আর বিশ পা দূরেও নেই। দীর্ঘোন্নত দেহ, জেলে-টুপির নীচে থেকে ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল গোছায় গোছায় বেরিয়ে পড়েছে। এত আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে, এটা ভাবে নি গৌর, সে তৈরী ছিল না এর জন্য। পা কাঁপছে, থেমে পড়তে হবে নাকি এই কাঁপুনির জন্য? তা হলে ত লজ্জার সীমা থাকবে না। হঠাৎ আবার মনে হল—মাথার টুপি বুঝি ঝুলে পড়েছে একপাশে, কিন্তু টুপি দুরস্ত করার সময় বা কই? ইয়ানের দেখে ফেলার সম্ভাবনা যদি না থাকত, গৌর নিশ্চয়ই রাস্তার ধারের ফার্জ বনে লুকিয়ে পড়ত।

ইয়ানেরও অবস্থা প্রায় একই রকম। সেও পারলে পিছন ফিরে দৌড় দিত, বা ঠিক সেই জায়গায় পাশ কাটাবার কোন গলি থাকলে, মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ত সেই গলিতে। কিন্তু সে-সব সুযোগ অনুপস্থিত, দেখা হয়ে গেল দু'জনের।

পাছে সরু রাস্তায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, এই ভয়ে ইয়ান একেবারে এক পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল পথের, দাঁড়িয়ে একবার মাত্র লাজুক চোখের দৃষ্টি গৌরের দিকে তুলে তারপরই নামিয়ে নিল চোখ।

গৌরও, একবার আধ সেকেণ্ডের জন্য তাকাল ওর দিকে। কিন্তু ইয়ান কি দেখল তা? দেখল কি যে সেই আধ সেকেণ্ডের দৃষ্টিতে নিহিত ছিল কত ব্যথা, কত ভর্ৎসনা? কে জানে!

ইয়ান টুপিতে হাত তুলে বলল—"কেমন আছেন, মামোয়াজেল গৌর?"

গৌর উত্তর দিল—"মসিয়ঁার ইয়ান! আপনি কেমন আছেন?"

আর কিছু না। ও চলে গেল পাশ দিয়ে।

"দেখেছিলাম ত !" বলল কাপ্তেন—"তবে মাস খানিক আগে। তখনও সে আরও পশ্চিমে যাচ্ছে। তখনও মাছ ধরে আশা মেটেনি তাদের। হ্যাঁ, মাসখানিক আগে। তারপরে দেখিনি আর—"

কেউ দেখেনি। কেউ দেখবে না আর। পোর্স ইভোন প্লাউবাজ-লানেক দুটো গাঁয়ের মাঠ বন সবুজে সবুজে মনোরম হয়ে উঠেছে, পাখি গাইছে কাকলী তুলে, ফুল ফুটেছে নানা বর্ণের সমারোহে, গৌরের অঙ্গে ঝলমলিয়ে উঠেছে মোহনিয়া বসনভূষণ, ইয়ান কিন্তু আসবে না এসব দেখতে। যতদিনই প্রতীক্ষা করুক গৌর, ইয়ান আসবে না আর।

দুই বছর আগে মেরির কেবিনে সিলভেস্টার একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদা, তুমি বিয়ে করবে কবে ?"

সে হেসে উত্তর দিয়েছিল, "করব একদিন। এই সমুদ্রকেই বিয়ে করব।"

সে প্রতিশ্রুতি ইয়ান ভুলে ছিল। কিন্তু সমুদ্র ভোলে নি। গৌরের বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বাগ্‌দত্ত স্বামীকে। বজ্রের নির্ঘোষে, ঝঞ্ঝার গর্জনে, মুষলধার বর্ষণে উদ্‌যাপিত হয়েছে তাদের শুভপরিণয়।

দুইবৎসর আগের সেই দিনে মেরির কেবিনে উপস্থিত সবাইকে ইয়ান নিমন্ত্রণ করেছিল—"তোমরা সবাই থাকবে আমার বিবাহের দিন।" থেকে ছিল তারা সবাই ঠিকই, গিয়েছেও সবাই ইয়ানের বিয়েতে বরযাত্রী। সবাই একমাত্র সিলভেস্টার ছাড়া, সে-বেচারী দাদার বিয়ের আগেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে মাটি-মায়ের বুকে পৃথিবীর উলটো দিকে।

সমাপ্ত